করব। কারণ, শান্তিপর্বের বেশ কিছু অধ্যায়ে কখনও রাজাকে (ক্ষত্রিয়কে) কখনও পুরোহিতকে (ব্রাহ্মণকে) প্রধান বলা হয়েছে।

পুরোহিত-এর বিষয়টি সপ্তাঙ্গের মধ্যে আলোচিত না হ'লেও বেশ কিছু অধ্যায়ে পুরোহিতকে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৭৩নং অধ্যায়েও প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে রাজা ধর্ম অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিয়োগ করবেন (১২/৭৩/১)। রাজা এবং পুরোহিত পরস্পরের অভিন্ন বন্ধু হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। রাজা এবং পুরোহিত (ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ) এর মধ্যে সদ্ভাব থাকলে প্রজারা সুখী হয় এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলে প্রজারা বিনষ্ট হয় (১২/৭৩/১২) রাজপুরোহিত ধর্ম ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হ'লে প্রজাদের সবদিক থেকে মঙ্গল হয়। ৭৪নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজ্যের রক্ষা ও বৃদ্ধি রাজার অধীন আবার রাজার বৃদ্ধি ও রক্ষা পুরোহিতের অধীন। ব্রহ্মা একই উপাদানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন। আবার কোনও কোনও শ্লোকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছে। আসলে শান্তিপর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের মন্ত্রবল এবং রাজার তথা ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবল ও বাহুবল এক সাথে মিলিত হ'লে প্রজাদের পালন/শাসন সহজ হয় (১২/৭৪/১৪-১৫)। বর্তমান যুগেও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মতাদর্শের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজার সহায়ক গোষ্ঠী হিসেবে ব্রাহ্মণের ভূমিকাকে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) এবং ক্ষত্রিয় (রাজাকে) পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ তথা সহায়ক হিসেবে ব্যাখ্যা করার মধ্যে বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়েছে। ৭৯নং অধ্যায়ে পুরোহিতকে অন্যতম অমাত্য হিসেবে গণ্য করা হ'লেও ৮৩নং অধ্যায়ে পুরোহিত এবং অমাত্য--এই দু'টি পদকে ভিন্ন হিসেবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রনা গ্রহণের পর রাজা ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ পুরোহিতের কাছে সেই মন্ত্রণা সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে সেই মন্ত্রণা যদি কাজের উপযোগী হয় তাহলে রাজা তা অনুসরণ করবেন (১২/৮৩/৫৪)।

৩৪.৭.২ মন্ত্রী

শান্তিপর্বের ৮০নং অধ্যায়টি শুরু হয়েছে যুধিষ্ঠিরের একটি প্রশ্ন দিয়ে—এক একটি সংসারে অত্যন্ত অল্প কাজ থাকলেও তা কোনও একজন মানুষের পক্ষে করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে; এর চেয়ে রাজার কাজ অনেক বেশী। সুতরাং, একাকী রাজা কিভাবে সে কাজ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজার কাজে সহায়তা করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ৮৩নং অধ্যায়েও রাজার পরামর্শ বা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে সভাষদ ও অমাত্যের কথা বলা হয়েচে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অমাত্য ও মন্ত্রী পদ দু'টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হ'লেও এখানে অমাত্য ও মন্ত্রী পদ দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রীদের রাজা নিয়োগ করবেন। কিন্তু কী ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে অনেক অধ্যায়েই মন্ত্রীর অনেক গুণেরই উল্লেখ করা হয়েছে। সৎকুলে জন্ম, সৎস্বভাব সম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশ ও কাল অনুসারে কাজ করতে সক্ষম, রাজার প্রতি অনুগত—এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। ৮৩নং অধ্যায়ে ২৪ থেকে ৪০ শ্লোকে অর্থাৎ ১৭টি শ্লোকের

মাধ্যমে কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রী হওয়ার অযোগ্য সে সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলহীন মন্ত্রী কর্তব্য ঠিক করতে সমর্থ হয় না এবং সব কাজেই সন্দেহ করে (১২/৮৩/২৫)।

শান্তিপর্বে রাজার তিন ধরনের মন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রী, ঘনিষ্টভাবে মন্ত্রণার যোগ্য তিনজন মন্ত্রী নিয়ে মোট পাঁচ মন্ত্রী থাকবেন। ৮৩নং অধ্যায়ের ২১-২২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যাদের বুদ্ধি বিষয়সম্পন্ন ও স্বভাব সুন্দর হয় এবং তেজ, ধৈর্য, ক্ষমা, পবিত্রতা, অনুরাগ, পদমর্যাদা অনুরূপ কার্যকলাপ ও মেধা থাকে---এ সমস্ত গুণগুলি পরীক্ষা করে সবসময়ে দৃঢ় সংসল্প, কার্যভার বহনে সক্ষম ও কপটতাশূন্য পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন। এই সমস্ত মন্ত্রীদের মধ্যে কোন্ কোন্ মন্ত্রী রাজার সঙ্গে মন্ত্রণার উপযুক্ত নয় সেই বিষয়টিও এই অধ্যায়ের ৩৫ থেকে ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। যেমন, যে মন্ত্রী, পিতার ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করে কোথাও দণ্ডিত হয়েছেন সেই মন্ত্রী সকলের প্রিয় হ'লেও গুপ্ত মন্ত্রণার যোগ্য নয় (১২/৮৩/৩৯)। শান্তিপর্বে মন্ত্রীর চেয়ে মন্ত্রণাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। রাজ্যের মূল হ'ল গুপ্তচর এবং এতে মন্ত্রণাই প্রধান। মন্ত্রীরা যেহেতু বেতনের জন্যই রাজাকে অনুসরণ করেন, সেহেতু মন্ত্রীদের রাজ্যের মূল বা সার বলা যায় না (১২/৮৩/৪১)।

মন্ত্রণার বিষয়ে তিনজন মন্ত্রীর কথা বলা হ'লেও রাজা মন্ত্রীদের প্রধান হিসেবে একজনকে বাছাই করবেন। ৮০ নং অধ্যায়ের ২৫নং শ্লোকে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্মদেব সর্তক করে দেন---দুই বা তিনজনকে প্রধানমন্ত্রী করা উচিত নয়। কারণ তারা পরস্পরকে সহ্য করে না এবং একই বিষয়ে সবসময় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়। যিনি শক্তিশালী, যশস্বী, সদাচারী; যিনি স্বেচ্ছায় অনর্থ ঘটাবেন না এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের জন্য নিজ কর্তব্য থেকে সরে আসবেন না, এমন দক্ষ ও বাকপটু লোককেই রাজা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন (১২/৮০/২৬-২৭)। অবশ্য, মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শের পর রাজা ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং রাজা যদি সেই মন্ত্রণা কাজের উপযোগী বলে মনে করেন তবেই সেই মন্ত্রণা গ্রহণ করবেন (১২/৮৩/৫৩-৫৪)।

৮৫ নং অধ্যায়ে অবশ্য ৩৮ জন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন আইন সভায় করা হয় সেভাবেই রাজার মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন বর্ণের আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই সংরক্ষণ জনসংখ্যার অনুপাতে কিনা সে সম্পর্কে কোনও কিছু বলা নেই। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিদ্বান, চতুর, গৃহস্থ ও পবিত্র চারজন ব্রাহ্মণ, বলবান ও অস্ত্রধারণে সক্ষম আটজন ক্ষত্রিয়, ধনবান একুশ জন বৈশ্য এবং উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবায় যুক্ত ও শিক্ষিত তিন জন শূদ্র, অনুরাগাদি অষ্টগুণযুক্ত একজন সূত ও একজন পৌরাণিক---এই ৩৮জন ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। এদের প্রত্যেকেরই বয়স পঞ্চাশ এর কম হওয়া চলবে না। এই ৩৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৮জন উপস্থিত হ'লেই রাজা তাদের কাছে মন্ত্রণার প্রস্তাব করবেন। তারপর রাজা সেই মন্ত্রণার সিদ্ধান্ত রাজ্য মধ্যে প্রচার করবেন এবং প্রবীণ শাসনকর্তাদের জানিয়ে দেবেন (১২/৮৫/৭-১২)।

মন্ত্রীদের নিয়োগের পর তাদের কাজ ও গতিবিধির উপর নজর রাখা রাজার কর্তব্য। মন্ত্রীদের নিয়োগের পর রাজা বিশ্বস্ত, স্বদেশজাত, স্থির প্রকৃতির ও সবরকমের সুপরীক্ষিত কর্মচারীদের দ্বারা মন্ত্রীগণের দোষ ও গুণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। যদি দেখা যায় কোনও মন্ত্রী অসৎ তাহলে তিনি তার ব্যবস্থা নেবেন। যদি রাজা দেখেন অনেক মন্ত্রীই অসৎ তাহলে সব মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজা এক সঙ্গে কোনও ব্যবস্থা

নেবেন না, কারণ তাতে মন্ত্রীরা একযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে রাজা মন্ত্রীদের হাত থেকে ক্রমশ ক্ষমতা কেড়ে নেবেন এবং এক মন্ত্রীর সঙ্গে অন্য মন্ত্রীর বিরোধ ঘটিয়ে দুর্বল করবেন এবং তারপরে শাস্তি দেওয়াই রাজার উচিত (১২/৮২/৬০-৬৫)।

৩৪.৭.৩ কোষ

যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কোষ, অর্থাৎ অর্থ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপর্বে ও রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা ও সমৃদ্ধির জন্য কোষের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোষ দ্বারাই ধর্মের বৃদ্ধি হয় ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং কোষ সংগ্রহ করে বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা রাজার প্রধান ধর্ম (১২/১৩৩/২)। এমনকি ধর্মের তুলনায় অর্থকে প্রধান বলা হয়েছে; কারণ, ধর্ম ও অর্থ উভয়েই প্রত্যক্ষ সুখ কিন্তু সংসার জগতে ধর্ম-অধর্মের ফল প্রত্যক্ষ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না কিন্তু অর্থের ফল প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝা যায় (১২/১৩৪/১-২)।

কোষ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা---রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কোষের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ক্ষমতা না থাকলে অর্থ রক্ষা করা যায় না আবার অর্থ না থাকলে ক্ষমতার অস্তিত্বও বিপন্ন হয় (১২/১৩৩/৪)। ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মধ্যে অর্থই প্রধান। ধর্ম ও ক্ষমতার মধ্যে ক্ষমতাই প্রধান; কারণ ক্ষমতা থেকেই ধর্ম উদ্ভূত হয়; অর্থাৎ ধর্ম ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন, বলবান পুরুষ দুষ্কর্ম করলেও তা সৎকর্ম বলে বিবেচিত হয় (১২/১৩৪/৬,৮)। আবার, ক্ষমতার চেয়ে অর্থ বেশী ক্ষমতাশালী কারণ সম্পত্তি থাকলে ক্ষমতা আয়ত্বহয় এবং বল আয়ত্ব হ'লে উপযুক্ত মন্ত্রীগণকে পাওয়া যায়। যে রাজার নিকট ধনভাণ্ডার নেই সেই রাজাকে সাধারণ মানুষও অবহেলা করে; রাজার কাছে অল্প অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না এবং রাজার কাজ করতেও উৎসাহিত হয় না (১২/১৩৩/৬)। অর্থের-দ্বারা রাজার দোষ-ত্রুটিও ঢাকা পড়ে (১২/১৩৩/৭)। এক কথায়, যে রাজার অর্থ নেই, সেই রাজার মৃত্যুর মতই কষ্ট করে দিন কাটে। অতএব, রাজার অর্থ, সেনা ও মিত্রের সংখ্যা বাড়ানো কর্তব্য। অর্থদ্বারা ইহলোক, সত্য ও ধর্ম--সবকিছুই আয়ত্ব করা যায় (১২/১৩৩/৪৩)।

অর্থসংগ্রহের যৌক্তিকতা---রাজার অর্থের প্রয়োজন হ'লেও প্রজারা রাজাকে অর্থ দেবে কেন, অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা কি? এই প্রশ্নটি শান্তিপর্বে অলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজা যেহেতু প্রজাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন সেহেতু তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের অধিকারী। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আলোচনাতেও দেখা যায়, প্রথমে মনু রাজ্যভার নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু মানুষেরা কর দিতে স্বীকার করলে তবেই মনু রাজ্যভার নিতে রাজী হন। বস্তুত, রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে করপ্রদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। ৮৮নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ধর্মার্থী রাজা সব সময়েই প্রজাদের মঙ্গল কামনায় তৎপর হয়ে দেশ, কাল, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে প্রজাদের প্রতিপালন ও মঙ্গলজনক কাজ করবেন। এই কাজগুলি করার জন্য যে অর্থের দরকার তা প্রজারা কর হিসেবে দেবে।

কোষ সংগ্রহের নীতি---অর্থ বা কোষ রাজার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'লেও কোষ সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হবেন এবং রাজার পক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ভালো, কারণ, অতি

ধর্মপ্রাণ, নরম স্বভাবের রাজার পক্ষে কোষ সংগ্রহ করা যায় না; আবার অত্যন্ত লোভী ও হিংস্র রাজার পক্ষে কোষ সংগ্রহে প্রজা-অসন্তোষ তথা বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। ৮৭ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজা ও করদাতা উভয়েরই যাতে সুবিধা হয় সেরকম বিবেচনা করে করগ্রহণের নিয়ম রাজার ঠিক করা উচিত। ৮৮নং অধ্যায়ে করসংগ্রহের ব্যাপারে একটি উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, ভ্রমর যেমন ফুলে আঘাত না করে তা থেকে মধু সংগ্রহ করে, মানুষ যেমন গরুর বাঁট থেকে বা বাছুরকে খুব কষ্ট না দিয়ে দুধ দোহন করে, জোঁক যেমন মানুষের গা থেকে আস্তে আস্তে রক্ত শোষণ করে এবং বাঘিনী যেমন তার বাচ্ছাদের দাঁত দিয়ে ধরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায় কিন্তু তাদের আঘাত করে না, রাজাও সেভাবে প্রজাদের অত্যাচার বা নিঃস্ব না করে কোমল উপায়ে কর গ্রহণ করবেন। রাজা প্রথমে কম পরিমাণ কর স্থির করে প্রজাদের উন্নতির দিকে নজর দেবেন এবং প্রজাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে করের পরিমাণ বাড়িয়ে যাবেন। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যেভাবে বাছুরকে ক্রমশ বেশী বেশী ভার বইতে দেওয়া হয় সেভাবে রাজাও ক্রমশ বেশী বেশী কর চাপিয়ে প্রজাদের সহ্যসীমা বাড়াবেন। গোপালক যেমন প্রথমে আদর করে বাছুরের গলায় দড়ি পরায় সেরকমভাবে রাজাও নরমভাবে যত্ন নিয়ে প্রজাদের উপর কর ধার্য করবেন। একবার গলায় দড়ি পরাতে পারলে গরু যেমন আর দুর্দান্ত হবে না সেরকম একবার কর ধার্য করতে পারলে প্রজারাও আর দুর্দান্ত হবে না। তারপর রাজা উপযুক্ত উপায়ে সেই প্রজাদের কাছ থেকে নিয়মিত কর নিতে থাকবেন। অবশ্য, রাজাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, রাজা অস্থানে বা অসময়ে প্রজাদের উপর কর বসাবেন না। যথাকালে যথানিয়মে মিষ্টি কথা বলে প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপাবেন।

কোষের উৎস---কোষবৃদ্ধির উপায় হিসেবে শান্তিপর্বে রাজাকে নিজরাজ্য ও পররাজ্য থেকে অর্থসংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজা পররাজ্য থেকে কোষ সংগ্রহ করবেন। নিজ রাজ্য থেকে কোষ সংগ্রহের বড় উৎস হ'ল কর সংগ্রহ করা। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প থেকে রাজা কর সংগ্রহ করবেন। কৃষি-করই রাজার কোষ সংগ্রহের বড় উৎস। প্রজাদের উৎপাদিত ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা কর হিসেবে সংগ্রহ করবেন। কৃষি-কর ছাড়া রাজা বণিকদের কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয় কর, পণ্য আমদানি ও রপ্তানির উপর কর, জল ও স্থল পথকর এবং শিল্পজীবিদের উৎপাদন পরীক্ষা করে তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করবেন। ৬৯ নং অধ্যায়ে আবার বলা হয়েছে, সোনার খনি, নুন উৎপাদনের স্থান, খেয়া-ঘাট, বনের হাতি ধরার উপর রাজা কর স্থাপন করবেন। বৈশ্য বর্ণের মানুষ যেহেতু কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সেহেতু রাজা বৈশ্যদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

কর গ্রহণ ছাড়াও রাজা অপরাধীব্যক্তিদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ অর্থ আদায় করবেন।

এছাড়া প্রাচীর নির্মাণ, সৈন্যদের ভরণপোষণ, যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে রাজা অর্থসংগ্রহ করবেন। অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা রাজার উচিত নয়।

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি আপৎকালীন অবস্থা দেখা দেয় তখন রাজা কর সংগ্রহের পরিবর্তে নিজ কোষে সংগৃহীত ধন ব্যয় করে রাজ্য রক্ষা করবেন। আবার রাজ্যের প্রজারাও রাজার কোনও আপৎকালে অতিরিক্ত কর দিয়ে রাজাকে রক্ষা করবেন।

কোষ সংগ্রহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা---কর সংগ্রহের ব্যাপারে শান্তিপর্বে এক প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের

কথা বলা হয়েছে। রাজা প্রতিগ্রামে একজন করে অধিপতি (প্রধান) নিযুক্ত করবেন। এভাবে কাউকে দশটি গ্রামের, কাউকে কুড়িটি গ্রামের, কাউকে একশো গ্রামের এবং কাউকে একহাজার গ্রামের অধিপতি করবেন। এক গ্রামের অধিপতি দশগ্রামের অধিপতির কাছে, দশগ্রামের অধিপতি কুড়ি গ্রামের অধিপতির, কুড়ি গ্রামাধিপতি একশো গ্রামাধিপতির এবং একশো গ্রামাধিপতি এক হাজার গ্রামাধিপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং সকলেই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির কাছে নিজ নিজ প্রজাদের দোষ প্রকাশ করবেন। গ্রামাধিপতি গ্রামের যাবতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ন্যায্য অংশ বেতন রূপে ভোগ করবেন। এক গ্রামাধিপতি দশগ্রামাধিপতিকে, দশগ্রামাধিপতি কুড়ি গ্রামাধিপতিকে কর প্রদান করবেন এবং একাংশ নিজের বেতন হিসেবে নেবেন। শতগ্রামের অধিপতি এক বহুজনপূর্ণ গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করবেন। হাজার গ্রামাধিপতি সেই রাজ্য মধ্যে শতগ্রামাধিপতির অধীন কোনও একটি শাখা নগরের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতন হিসেবে পাবেন। এই সমস্ত কাজ পরিচালনা ও তদারকির ভার একজন মন্ত্রীর উপর অর্পণ করা হবে। মন্ত্রী দায়বদ্ধ থাকবেন রাজার কাছে।

৩৪.৭.৪ দণ্ড

কৌটিল্যের রাষ্ট্র সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সপ্তপ্রকৃতি বা উপাদানের মধ্যে দণ্ড নামে একটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রাচীন ভারতে দণ্ড শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দণ্ড শব্দটি দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যেমন বোঝানো হয়েছে, দণ্ড অর্থে বিচার ব্যবস্থা, শাস্তি ও সৈন্যকেও বোঝানো হয়েছে। দণ্ড শব্দটি যখন রাজ্যের প্রকৃতি হিসেবে (সপ্ত প্রকৃতি/উপাদানের মধ্যে একটি) উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে দণ্ড শব্দটির অর্থ হল সৈন্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ড শব্দটি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে। যেমন ১২১ নং অধ্যায়ে দণ্ডের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'এই জগতে যার দ্বারা সকলে বশবর্তী হয় তার নাম দণ্ড'। শান্তিপর্বে সৈন্যসম্পর্কিত আলোচনায় শূর (সৈন্য) শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। শান্তিপর্বের সময় বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যেহেতু গড়ে উঠতে থাকে এবং সৈন্যরা মূলত ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্গত বা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত সেহেতু ক্ষত্রিয় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রকৃতি হিসেবে (সপ্তপ্রকৃতির মধ্যে একটি) দণ্ড বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সৈন্য শব্দটিই ব্যবহার করব।

শান্তিপর্বে সৈন্য সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজার অত্যন্ত সহায়ক হ'ল সৈন্যবাহিনী। যে রাজার সৈন্যগণ সন্তুষ্ট, রাজার দ্বারা সান্তনাপ্রাপ্ত ও শত্রুদিগকে প্রতারণা করতে সক্ষম সেই রাজার অল্প সৈন্য দিয়ে পৃথিবী জয় করা সম্ভবপর। ১০০ তম অধ্যায়ে আমরা সৈন্যদের এক স্তরবিন্যাসও লক্ষ্য করি। রাজা সৈন্যদের মধ্যে কিছু লোককে দশ সৈন্যের নায়ক, কিছু লোককে শতসৈন্যের নায়ক এবং কোনও প্রধান ও আলস্যহীন বীরকে এক হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ করবেন। এই অধ্যায়ে কিভাবে সৈন্যসজ্জা করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। সৈন্যদের সামনে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী স্থাপন করার কথা ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু ৯৯ অধ্যায়ের ৯নং শ্লোকে প্রথমে গজারোহী যোদ্ধাদের, পরে রথী যোদ্ধাদের, রথী যোদ্ধাদের পিছনে অশ্বারোহী সৈন্য এবং তারপর বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। অস্ত্রের মধ্যে গরু, মোষ, অজগর এবং হাতির চামড়া দিয়ে তৈরী বর্ম, লোহা দিয়ে তৈরী শঙ্কু, কবচ,

খড়্গ, কুঠার, ফলক, ঢাল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

অবশ্য, অস্ত্রের ব্যাপারে যোদ্ধাদের দেশ ও বংশের আচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীর দেশের যোদ্ধারা নখর ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করে থাকেন। এদেশের যোদ্ধারা অত্যন্ত বলবান এবং নির্ভীক। উশীনর দেশের যোদ্ধারা সব রকম অস্ত্রে পারদর্শী এবং বীর। পূর্ব দেশের যোদ্ধারা হাতিতে চেপে যুদ্ধ করতে এবং কপট যুদ্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। যবন, কাম্বোজ ও মথুরা দেশের লোকেরা মল্ল যুদ্ধে নিপুণ এবং দক্ষিণ দেশের লোকেরা তরবারি যুদ্ধে অভ্যস্ত।

১০১ নং অধ্যায়ে দেহের গড়ন অনুযায়ী সৈন্যদের দক্ষতা ও স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যাদের দেহের গড়ন দৃঢ়, দেখতে সুন্দর, বুকের পাটা বিশাল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দৃঢ় সেই সব বীরগণ যুদ্ধের কথা শুনে উত্তেজিত ও আনন্দিত হন। ১৬ থেকে ২০ নং শ্লোকে যে সমস্ত যোদ্ধাদের কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত যোদ্ধাগণ বনজ বা বনভিত্তিক অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। যাদের চুল খাড়া, মুখ লম্বা ও মোটা, উঁচু কাঁধ, ঘাড় মোটা ও মাংসবহুল, দেখতে বিকট, মাথা গোলাকার এবং বিশাল যা অনেকটা বিড়ালের মুখের মত, যাদের কণ্ঠস্বরে কঠোরতা থাকে, অত্যন্ত ক্রোধী, গর্বিত, ভয়ঙ্কর ও ধর্মজ্ঞানহীন, যারা যুদ্ধে কখনও পিছু হটেনা এবং দেহের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে সেই ধরনের যোদ্ধাদের যুদ্ধের সামনে রাখা উচিত এবং পুরস্কৃত করা উচিত; কারন এই ধরনের সৈন্যরা ধৈর্য্য সহকারে শত্রুদের আঘাত সহ্য করতে পারে এবং আঘাত দিতেও পারে। এই ধরনের সৈন্যরা ধর্ম-অধর্মের নীতি ভেঙে ফেলে। রাজার উপরেও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং, এই ধরনের সৈন্যদের সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে সবসময় আয়ত্বে রাখা উচিত।

৩৪.৭.৫ মিত্র

শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজাকে শত্রু ও মিত্রকে বাছাই করা এবং প্রয়োজনে অবিশ্বাস ও বিশ্বাস করার উপরে বিশেষ মনোযোগী হতে বলা হয়েছে। ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ও বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে রাজাকে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ৮০ নং অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদের মিত্র কাকে বলে এবং মিত্র কতরকমের হয় সে সম্পর্কে উপদেশ দেন। রাজার বিপদে যিনি ভীত হন, রাজার উন্নতিতে যিনি ঈর্ষান্বিত হন না আবার অবনতিতে যিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন তিনিই রাজার মিত্র। ভীষ্মদেব রাজার চাররকমের মিত্রের কথা বলেন। (১) সহার্থ - অর্থাৎ, যার সঙ্গে রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ হন; (২) ভজমান - যার সঙ্গে বংশানুক্রমিকভাবে মিত্রতার সম্পর্ক রয়েছে। (৩) সহজ - জ্ঞাতিগোত্রের ভাই। (৪) কৃত্রিম - অর্থাৎ, যার সঙ্গে ধনদান ইত্যাদির দ্বারা মিত্রতা গড়ে উঠেছে। এই চার রকমের বন্ধুর মধ্যে ভজমান ও সহজ এই দুই ধরনের মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার (সহার্থ ও কৃত্রিম) মিত্র সম্পর্কে সবসময়েই আশঙ্কা করতে হয়। অবশ্য সবরকমের মিত্রের উপর আশঙ্কা করা উচিত, কারণ কার্যবশত মিত্র শত্রু হয়ে পড়ে আবার শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। এছাড়াও ভীষ্মদেব আরোও এক ধরনের মিত্রের কথা বলেছেন। ধর্মাত্মা মানুষমাত্রই পঞ্চম সহায় বা মিত্র; কারণ ধর্মাত্মা মানুষ একজনের পক্ষপাতী হন না আবার অর্থের প্রলোভনে দু-পক্ষেরই কাছে মিত্রের ভান করেন না। যে পক্ষ ধর্ম অনুযায়ী চলেন সেই পক্ষের সহায় হন। আবার কোনও পক্ষেই ধর্ম না দেখলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন।

মিত্র কাকে বলে এবং কতরকমের মিত্র হ'তে পারে সে সম্পর্কে বলা হ'লেও মিত্র সম্পর্কে কতকগুলো সাধারণ নিয়মের কথা বলা হয়েছে ১৩৮ নং অধ্যায়ে। প্রথমত, শত্রু-মিত্র বাছাই করা সবসময় দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। কোনও কোনও সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী শত্রুও মিত্র হয় আবার মিত্রও শত্রু হ'তে পারে। সুতরাং মিত্র বাছাই করতে গেলে দেশ, কাল, পরিস্থিতি বিবেচনা করা দরকার। দ্বিতীয়ত, স্বার্থই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টির প্রধান কারণ। চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায় দেখা যায় না। স্বার্থেব কারণে শত্রুও বন্ধু হয় আবার বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। এ জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু স্বার্থপর সেহেতু নিজের ভাই, বাবা, মা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী সম্পর্কও স্বার্থচালিত। কেউ দান করে, কেউ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে এবং কেউ বা মন্ত্রপাঠ, হোম, জপ করে অন্যের প্রিয় হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, সুতরাং, রাজার পক্ষেও আত্মরক্ষার সুযোগ সুবিধা শত্রু-মিত্র বাছাই করার মাপকাঠি হওয়া উচিত। যে রাজা মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি সব সময় অবিশ্বাস করে অথবা উভয়কেই শুধুমাত্র বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে সেই রাজাকে স্থিরপ্রাজ্ঞ না বলে চঞ্চলবুদ্ধি সম্পন্ন বলাই ভাল। চতুর্থত, রাজার পক্ষে কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা উচিত নয়; কিন্তু রাজা প্রত্যেকের কাছেই নিজের বিশ্বাস তৈরী করবে।

৩৪.৭.৬ দুর্গ

শান্তিপর্বের ৮৬তম অধ্যায়ে ৬ রকমের দুর্গের কথা বলা হয়েছে। যেমন, মরুদুর্গ, ভূমিদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃত্তিকাদুর্গ ও বনদুর্গ। এর মধ্যে যে দুর্গের বাইরে শক্ত প্রাচীর ও গভীর পরিখা থাকবে এবং দুর্গেব ভিতরে ধান, অস্ত্র, হাতি, ঘোড়া ও রথ থাকবে, যে নগরে বিদ্বান শিল্পী, ধার্মিক ও সবরকম কাজে নিপুণ মানুষজন থাকবে সেই দুর্গে রাজা বসবাস করবেন। সেই নগরে বিভিন্ন ধরনের শস্যও মজুত থাকবে। নানারকম দ্রব্যাদির দোকান, সব রকম বিরোধ মীমাংসার জন্য আদালতও থাকবে। কোনওরকম উপদ্রব ও ভয় থাকবে না। ঘরগুলি হবে সুন্দর ও সাজানো; গান, বাজনা ও বেদধ্বনি চলতে থাকবে। বীর যোদ্ধা ও ধনীলোকের বসবাস থাকবে। মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারী ও সৈন্য রাজার অনুগত হয়ে বসবাস করবে।

রাজা যে দুর্গে বসবাস করবেন সেই দুর্গে কোষ, সৈন্য, মিত্র ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার ঘটাবেন। বিভিন্ন ধরনের দোষ, ব্যাধি প্রভৃতি নিবারণে যত্নবান হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, দ্রব্যসামগ্রী, ধাতব ও খনিজ পদার্থ, খাদ্যশস্য, ভেষজ ঔষধ প্রভৃতির এক বিশাল তালিকা এই অধ্যায়ের ১২ থেকে ৩৫ নং শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আচার্য, ঋত্বিক, পুরোহিত, মহাধনুর্ধর, রাজমিস্ত্রী, দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতি রাজা বিশেষ, যত্ন নিয়ে উপযুক্ত সব কাজে নিয়োগ করবেন। রাজা ধার্মিকদের সম্মান, অধার্মিকদের দমন ও সমস্ত বর্ণদের নিজ নিজ কাজে বিশেষ যত্ন নিয়ে নিযুক্ত করবেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে রাজা দুর্গকে কীভাবে সাজাবেন তারও এক বিস্তৃত বিবরণ ৬৯নং অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে দুর্গের পরিখাগুলি জল দিয়ে ভর্তি করবেন এবং সেই পরিখায় কুমীর, মকর, প্রভৃতি জলজন্তু ছেড়ে দেবেন এবং অসংখ্য শূল পুঁতে রাখবেন। যাতে আগুন না লাগে তার জন্য ঘরগুলি কাদা দিয়ে লেপে রাখবেন। রাত্রে, এমনকি দিনেও বাইরে আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। তীর্থস্থান, সভাগৃহ ও প্রধান স্থানগুলিতে গুপ্তচরের ব্যবস্থা রাখবেন। অস্ত্র ও সৈন্যঘর লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবেন। সবরকমের ঔষধপত্র, ভেষজ চিকিৎসক, বিষ চিকিৎসক, ক্ষত চিকিৎসক ও

ভূত চিকিৎসক এই চার রকমের চিকিৎসককে দুর্গের মধ্যে বাস করাইবেন। দুর্গ সজ্জার এ-বিবরণ দেখে মনে হয় প্রাচীন ভারতে নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং শান্তিপর্বের রচয়িতা বাস্তব জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এই দুর্গ সজ্জায়।

৩৪.৮ অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়টি শান্তিপর্বে আলাদাভাবে কোনও অধ্যায়ে আলোচিত না হ'লেও মিত্র-শত্রুর আলোচনায় সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন সম্পর্কিত আলোচনায় ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, নীতিসমূহ, যুদ্ধকৌশল, দুর্বল ও বলবান রাজার পক্ষে যুদ্ধে কি করা উচিত---এই সব প্রশ্নের উত্তরে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সপ্তাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা মিত্র-এর আলোচনায় রাজার মিত্র কে হবে এবং কতরকমের মিত্র হ'তে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সন্ধি ও যুদ্ধ সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্যগুলি আলোচনা করব।

৩৪.৮.১ সন্ধি

রাজা কার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলবেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সন্ধির বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কার কার সঙ্গে রাজার পক্ষে সন্ধি করা উচিত সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের ৬৯, ১৩১, ১৩৮, ১৩৯ এবং ১৬৮ অধ্যায়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজা যখন নিজেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে করবেন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলবান রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনই উচিত। অবশ্য বলবান রাজার সঙ্গে দুর্বল রাজার সন্ধি কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং, সুচতুর রাজা অপেক্ষাকৃত বলবান রাজার সঙ্গে সন্ধি করেও বলবান রাজাকে বিশ্বাস করবেন না। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে সন্ধি করলে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে তার সঙ্গেও সন্ধি করা রাজার উচিত। তৃতীয়ত, সন্ধি করতে ইচ্ছুক, গুণবান, উৎসাহসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে ধর্ম অনুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। চতুর্থত, প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুদের সঙ্গেও সন্ধি করা উচিত। যে রাজা বিপক্ষদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করতে রাজী হয় না সেই রাজা কখনই অর্থোপার্জন বা সুখ ভোগ করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ এবং শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করে সেই রাজার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়। পঞ্চমত, একবার কারও সঙ্গে শত্রুতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠলে পরে যদিও স্বার্থপূরনের জন্য পবস্পরের মধ্যে সন্ধি হয় তাহলেও পরস্পরকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রাজা নিজের বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করতে সমর্থ হয়। আর নির্বোধ রাজা নিজের অসাবধানতাবশত প্রতারিত হয়। এক্ষেত্রে ভীত হ'লেও নির্ভীকদের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। ষষ্ঠত, আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্মানুসারে জয় লাভের বাসনা করে তাহলে তার সঙ্গে অবিলম্বে সন্ধি করে ধীরে ধীরে নিজের গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্তব্য। সপ্তমত, শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্মানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করে তাহলে রাজা তাকে (শত্রুকে) কতকগুলি পরিত্যাগ করে বিপদ থেকে মুক্ত হবেন। কারণ, রাজা

যে কোনও প্রকারে হোক জীবিত থাকলে পুনরায় আগের ন্যায় সম্পত্তিশালী হ'তে পারবেন। যদি অন্ত:পুরিকাগণও শত্রুর হস্তাগত হয় তাহলেও তাদের প্রতি দয়া না করে আত্মরক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। অথচ এই অধ্যায়ে'ই ১০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে শত্রু ধার্মিক হ'লে তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে কিন্তু অধার্মিক হ'লে তার প্রতি যুদ্ধ করাই রাজার কর্তব্য। রাজা যুদ্ধে নিহত হ'লে স্বর্গারোহন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন, আর শত্রুকে পরাজিত করলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। ১৩ এবং ১৪নং শ্লোকে অবশ্য রাজাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধ সময় উপস্থিত হ'লে যুদ্ধ পরিত্যাগের বাসনা করে বুদ্ধি কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় উৎপাদন করে যুদ্ধ করাই রাজার উচিত। আর যখন স্বপক্ষের ক্রোধবশত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করতে নিতান্ত অসমর্থ হবেন তখন দুর্গ থেকে প্রথমে পলায়ন করে পরে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা নিজ সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করে পুনরায় নিজরাজ্য অধিকার করবেন।

৩৪.৮.২ যুদ্ধ

শান্তিপর্বে যুদ্ধের তুলনায় সন্ধির উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ না করে শত্রুকে পরাজিত করাই রাজার কর্তব্য। কারণ, রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে যে জয়লাভ করেন তা সাধুসমাজে জঘন্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। রাজধর্ম তথা ক্ষাত্রধর্মকে একদিকে যেমন সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয়েছে অপরদিকে ক্ষাত্রধর্মকে সবচেয়ে পাপজনক ধর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, রাজার যুদ্ধের সঙ্গে বহুলোকের প্রাণ নষ্ট হয়। একারণে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন— যে রাজা জয়ের আশায় যুদ্ধের সময় মানুষকে হত্যা করেন সেই রাজা জয়লাভের পরে প্রজাদের সবদিক থেকে উন্নতি করার চেষ্টা করবেন এবং দান, যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বারা পাপ স্খালন করবেন।

যুদ্ধের সিদ্ধান্তের আগে বিবেচ্য বিষয়

যে কোনও রাজার পক্ষেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবার আগে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, যদি কোনও রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় না থাকে তাহলে রাজার পক্ষে যুদ্ধে না গিয়ে নিজের যা সম্পদ আছে সেই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কোনও রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় কিনা তা বোঝা উপায় হ'ল সেই রাজ্যের জনপদ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সম্পদে পূর্ণ কিনা, প্রজাগণ সন্তুষ্ট, সম্পদশালী ও বশীভূত কিনা এবং মন্ত্রীগণের সংখ্যাও অসংখ্য ও অনুগত কিনা তার উপর। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাজা প্রথমে নিজের পঞ্চইন্দ্রিয়কে জয় করতে সক্ষম কিনা তা বিবেচনা করা উচিত। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় রাজাই শত্রু জয় করতে পারেন। তৃতীয়ত, রাজা নিজের মন্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সামন্ত রাজা, নগর ও জনপদবাসীদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন। কারণ এদের বিরোধীতা রাজাকে বিপদে ফেলতে পারে। অজ্ঞ, জড়, বধির প্রভৃতির মতো দেখতে যারা, ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে সহনশীল এবং যাদের পরীক্ষা করে সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন বলে জানা গেছে এরকম বিচক্ষণ মানুষকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করে রাজা নিজের মিত্র, পুত্র, মন্ত্রী ইত্যাদি লোকজন সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। গুপ্তচররা যাতে একে অপরকে চিনতে না পারে তার ব্যবস্থাও করবেন। এমনকি, গুপ্তচররা কি করে তা দেখার জন্য বাজার-হাটে, লোকসমাজে ও ভিক্ষুকগণের কাছে অন্য লোক নিয়োগ কববেন। এভাবে রাজা দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে জেনে নেবেন। চতুর্থত শুধুমাত্র

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, বৈদেশিক পরিস্থিতিও রাজা মূল্যায়ন করবেন। তিনি গুপ্তচরের মাধ্যমে উদাসীন (নিরপেক্ষ) শত্রু ও মিত্র রাজার ব্যবহার পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন যুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত কিনা।

যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রত্যেক রাজার যুদ্ধের কয়েকটি নীতি মেনে চলা উচিত। ৯৫ এবং ৯৬ নং অধ্যায়ে যুদ্ধের কয়েকটি নিয়মনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, রাজার পক্ষে ধর্মযুদ্ধই একমাত্র পথ। অধর্মের দ্বারা জয়লাভে রাজা কখনও সম্মান পান না। এধরনের জয়লাভ অকিঞ্চিৎকর ও নিন্দনীয়। অবশ্য ৯৫ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিপক্ষ যদি যুদ্ধে শঠতা অবলম্বন করে তাহলে রাজাও শঠতার আশ্রয় নেবেন। আবার এই অধ্যায়েরই কয়েকটি শ্লোকের পর বলা হয়েছে পাপাত্মারাই অধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করেই অসাধুকে জয় করেন। অধর্মযুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ শ্রেয়। দ্বিতীয়ত, কোনও সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত্র হ'লে তাকে পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। দুর্বল, সন্তানহীন, অস্ত্রহীন, বিপন্ন ও ক্ষতযুক্ত ক্ষত্রিয়কে বধ না করাই কর্তব্য। যদি কোনও সৈনিক যুদ্ধে আহত হয় তাহলে হয় সেই সৈনিককে তার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা নতুবা নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তৃতীয়ত, বিপন্ন, ভীত বা আত্মসমর্পণকারী সৈনিকের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়। চতুর্থত, বিষযুক্ত বা কুটিল (গোপনে প্রয়োগ যোগ্য) বাণ নিয়ে যুদ্ধ করা অন্যায়। পঞ্চমত, বর্মহীন, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা রাজার অনুচিত কাজ। পধমত, নিদ্রিত, পিপাসিত, পরিশ্রান্ত অথবা দিগ্‌ভ্রান্ত সৈনিকের উপর আঘাত করা অনুচিত। ষষ্ঠত, অস্ত্র ও কবচ ত্যাগ করার পর, যুদ্ধস্থানে যাবার সময়, পান ও ভোজনের সময়, অন্য কাজে নিযুক্ত, লেখার কাজে ব্যপৃত, রোগাক্রান্ত, যারা একজনের বস্তু অপরের কাছে নিয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত এমন ব্যক্তিকেও আঘাত করা নিষিদ্ধ। সপ্তমত, রাজদ্বারের প্রহরী অথবা মন্ত্রীদের প্রহরীদেরও বধ করা অন্যায়। অষ্টমত, যুদ্ধে বৃদ্ধ, বালক, ও নারীদের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ অনুচিত। পলায়মান যোদ্ধার পিছনেও আঘাত কবা অন্যায়। নবমত, রাজা ছাড়া অপর কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাজার সঙ্গে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দশমত, রাজার সৈন্য কর্তৃক পরাজিত কোনও শত্রুসৈন্যের সঙ্গে রাজা যুদ্ধ করবেন না। পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে একবছর ধরে দাসত্ব স্বীকার করার জন্য উপদেশ দেবেন। যদি এক বছরের মধ্যে সেই ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার না করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে একবছর পর মুক্তি দেওয়াই রাজার উচিত। একাদশ, রাজা যদি ক্ষমতাবলে শত্রুর কন্যাকে নিজ ঘরে নিয়ে আসেন তাহলে সেই কন্যাকে স্ত্রী করার জন্য এক বছর ধরে উপদেশ দেবেন। একবছরের পর সেই নারী যদি স্ত্রী হ'তে রাজী না থাকে বা অপর কোনও ব্যক্তিকে বিবাহ করতে মনস্থ করে তাহলে রাজা সেই নারীকে মুক্তি দেবেন। দ্বাদশ, যুদ্ধে প্রাপ্ত অন্যান্য দাসদাসীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। ত্রয়োদশ, যুদ্ধে যে সমস্ত গাভী লাভ হবে সেই সমস্ত গাভীর দুধ রাজা স্বয়ং ব্যবহার না করে ব্রাহ্মণগণকে দেবেন এবং বলদকে চাষের কাজে লাগাবেন। চতুর্দশ, দুই পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে উভয়পক্ষের মাঝে যদি শান্তিস্থাপনের জন্য কোনও ব্রাহ্মণ হাজির হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই দু'পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করবেন।

যুদ্ধযাত্রার সময়, কৌশল ইত্যাদি ঃ

যুদ্ধের নিয়মনীতিসমূহের উল্লেখ ছাড়াও যুদ্ধযাত্রার সময়, কৌশল প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ও স্থান পেয়েছে শান্তিপর্বে। যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং যোদ্ধারাও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে

চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় যুদ্ধ করাই প্রকৃত সময়। কারণ এ সময়ে পৃথিবী পাকা ফসলে পূর্ণ থাকে ও মাটিতেও জল থাকে। তাছাড়া এ সময় খুব শীত ও থাকে না এবং গরম ও থাকে না। এরকম সময় ছাড়াও রাজা যদি দেখেন শত্রুপক্ষ কোনও সংকটে পড়েছে তাহলে সেই সময়ও যুদ্ধের পক্ষে অনুকূল সময়। যেদিকে বাতাস, সূর্য ও শুক্রগ্রহ থাকে সেদিকে পিছন করে যুদ্ধ করলে জয়লাভ হয়। এই তিনটি বিষয় যদি আলাদা আলাদা দিকে থাকে তাহলে এদের মধ্যে আগের আগের বিষয়ই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাতাসকে পিছনে রেখে অবশিষ্ট দু'টিকে সামনে রেখেও যুদ্ধ করা যেতে পারে।

যে জমিতে কাদা, জল, বাঁধ ও মাটির টিলা নেই সেখানে অশ্বারোহী সৈন্যই উপযুক্ত, যেখানে কাদা বা গর্ত নেই সেরকম জমিতে রথারোহী সৈন্যই উপযুক্ত। আর যে জমিতে বহু ছোট গাছ, জলাশয় বা বাড়ি রয়েছে সেটি গজারোহী যোদ্ধাদের পক্ষে অনুকূল এবং যে জমি অত্যন্ত দুর্গম, বাঁশ ও বেতবনে ভর্তি, পর্বত ও উপবন সংযুক্ত সেরকম স্থানে পদাতিক বাহিনী উপযুক্ত। ঋতুবিচারে বর্ষাকালে পদাতিক এবং গজবাহিনী উপযুক্ত; অন্যান্য সময়ে পদাতিক ও অশ্ববাহিনী শ্রেষ্ঠ। রাজার সৈন্যবাহিনীতে যদি পদাতিক সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকে তাহলে সেই বাহিনী দৃঢ়। যে বাহিনীতে রথ ও অশ্বের সংখ্যা বেশী সেই বাহিনী বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ের জন্য উত্তম বলে বিবেচনা করা উচিত। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দেশ ও কাল অনুযায়ী রাজা যুদ্ধে অগ্রসর হবেন।

যুদ্ধযাত্রার জন্য সেই পথই অনুসরণ করা উচিত যা সমতল ও সুগম এবং যেখানে জল ও তৃণাদি সহজে পাওয়া যায়। বনে যাতায়াতে যেহেতু পথ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে সেহেতু বনবাসী গুপ্তচরদের কাছ থেকে পথের বিবরণ জেনে নেওয়া উচিত। সৈন্যদের সামনের দিকে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী পদাতিক সৈন্য স্থাপন করা প্রয়োজন। শত্রুদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদের শিবির এমন হওয়া উচিৎ যেখানে পৌঁছানো কঠিন, যার চারদিকে জলের পরিখা রয়েছে, আকাশচুম্বী প্রাসাদ রয়েছে এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। সৈন্য-শিবির স্থাপনের জন্য অনাবৃত স্থানের চেয়ে বহুগুণবিশিষ্ট বনের কাছাকাছি স্থানই উপযুক্ত, কারণ সেখানে ব্যূহ রচনা করার জন্য রথ ও বাহন থেকে নামা সৈন্যদের গোপন রাখা যেমন সহজ অপরদিকে শত্রুদের আঘাতের প্রত্যাঘাত করা এবং প্রয়োজনে লুকিয়ে পড়ার সুবিধা থাকে। এভাবে হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক বাহিনী একত্রিত করার পরেও রাজা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করার চেষ্টা করবেন। যদি সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে ভেদনীতি দ্বারা শত্রুরাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন। এতে ব্যর্থ হ'লে দাননীতি প্রয়োগ করা উচিত। এভাবে সাম (সন্ধি) ভেদ ও দাননীতি ব্যর্থ হ'লেই সব শেষে রাজা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবেন এবং যুদ্ধ সেভাবেই করা উচিত যাতে শত্রুপক্ষ সবদিক থেকে সংকটে পড়ে।

যুদ্ধের ব্যাপারে দুর্বল রাজার করণীয় বিষয় ঃ

যুদ্ধের ব্যাপারে সবল রাজা ও দুর্বল রাজার করণীয় বিষয়ও ভিন্ন হওয়া উচিৎ বলে শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্বল রাজার উচিৎ হ'ল দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করে নতজানু হয়ে শত্রুর তথা বলবান রাজার অধীনতা স্বীকার করে বিশ্বাস উৎপাদনে রত হওয়া। এভাবে বলশালী রাজার বিশ্বস্ত হয়ে মিত্রদের সৈন্যগণকে লাভ করে উত্তম মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যোগ্যব্যক্তিদের দ্বারা শত্রুরাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন এবং শত্রু-দ্বারাই শত্রুকে ধ্বংস করবেন। যে সমস্ত জিনিষ দুষ্প্রাপ্য যেমন নারী, পোষাক,

পালঙ্ক, আসন, বাহন, মূল্যবান বাড়ি, পশু, প্রভৃতি দিয়ে শত্রুকে আসক্ত করবেন যাতে সেই শত্রু ক্রমশ অলস হয়ে পড়ে। যে সমস্ত কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর সেই সমস্ত কাজ করতে পরামর্শ দেওয়া, ভোগবিলাস, উপকরণ বাড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রজাকে অনুপ্রাণিত করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শত্রুরাজার রাজকোষকে শূন্য করে দেওয়া প্রভৃতি পথগুলি দুর্বল রাজার অনুসরণ করা উচিত। এভাবে বলশালী রাজাকে ক্রমশ অলস, অর্থশূন্য, আসক্ত করে ধ্বংস করাই দুর্বল রাজার কর্তব্য।

যুদ্ধের ব্যাপারে বলবান রাজার করণীয় বিষয় ঃ

বলবান রাজার পক্ষেও করণীয় কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, বলবান রাজাও প্রথমে যুদ্ধে না গিয়ে সন্ধির মাধ্যমে জয়লাভে চেষ্টা করবেন। বলবান রাজা অন্য রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানের প্রজাদিগকে কর দানের বিনিময়ে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেবেন। প্রজাগণ যদি এতে সম্মত হয় তাহলে কোনও রকম বিরোধ না করেই তিনি সেই রাজ্য লাভ করবেন। যদি প্রজারা এতে সম্মত না হয় তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজা প্রজাদের বশীভূত করবেন।

যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা রাজার করণীয় বিষয় ঃ

যুদ্ধ জয়ের পর বলবান রাজা শত্রুকে ক্ষমা করবেন। কারণ, এতে শত্রুরা ক্রমশ তাকে বিশ্বাস করতে থাকে। রাজা যদি ক্ষমা না করে উগ্র স্বভাবই বজায় রাখেন তাহলে তিনি সকলের বিদ্বেষের পাত্র হয়ে থাকেন; আবার তিনি যদি অত্যন্ত নরম স্বভাবের হন তাহলে সবার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়েন। সুতরাং, রাজাকে প্রয়োজনবোধে উগ্রতা ও কোমলতা—এই দুই স্বভাবকেই অবলম্বন করতে হবে। ইউরোপের রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রেও পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের এক তাত্ত্বিক ম্যাকিয়াভেলি রাজাকে সিংহ (বলশালী)-শৃগালের (ধূর্ত) মিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্স'-এ ম্যাকিয়াভেলি রাজাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার ও নিজের কর্তৃত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন, তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থশাস্ত্র ও শান্তিপর্বে উল্লেখিত বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ যেহেতু বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ, সেহেতু রাজা দেশবাসীদের প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করবেন। যদিও ৪১নং শ্লোকে (অধ্যায় ১০২) রাজাকে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ছলকপটতার আশ্রয় না নিতে বলা হয়েছে, তবুও ৩৫-৩৭ নং শ্লোকে প্রজাদের কাছে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য মিথ্যা কথা বলাকেও অনুমোদন করা হয়েছে। প্রজাদের কাছে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রাজা বলবেন—"এই যুদ্ধে আমার সৈন্যরা যে এত বীরকে হত্যা করেছে তা আমার আদৌ প্রিয় নয় কিন্তু আমি কি করব? আমি বারবার নিষেধ করলেও তারা আমার কথা শোনেনি"। শত্রুপক্ষের কাছে এভাবে দুঃখ প্রকাশ করার পর রাজা অন্যস্থানে, অর্থাৎ নিজদেশে সেই বীর যোদ্ধাদের প্রশংসা করবেন যারা শত্রুপক্ষের প্রধান বীরদের হত্যা করেছে। বস্তুত, জনমতকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য যুদ্ধে যার ক্ষতি হয়েছে (অর্থাৎ, বিজিত শত্রু) সহানুভূতি এবং নিজরাজ্যে বীরত্ব প্রকাশ করবেন। এভাবে রাজা সকলের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠবেন এবং এর ফলে গোটা রাজ্যকে ভালোভাবে ভোগ করতে সক্ষম হবেন। সামরিকবাহিনী বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে যে বেশীদিন শাসনে রাখা যায় না সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এ কারণেই রাজাকে জনমত অনুকূলে আনার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩৪.৯ সারাংশ

এই এককটিতে মহাভারতের শান্তিপর্বের আলোচিত রাজতন্ত্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাজাকে মান্য করার কারণ, আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক ইত্যাদি বিষযগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে শান্তিপর্বের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি।

৩৪.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(২) শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজধর্মের বিষয়টি আলোচনা করুন।

(৩) শান্তিপর্ব অনুসরণে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৪) শান্তিপর্বে উল্লেখিত যুদ্ধের নিয়মাবলি কী কী?

(৫) শান্তিপর্বে বিদ্রোহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(১) রাজাকে মেনে চলার কারণগুলি কী কী?

(২) রাজার কর্তব্যগুলি কী কী?

(৩) গণরাজ্য সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(৪) শান্তিপর্ব অনুযায়ী মিত্র কয় প্রকার?

(৫) যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা রাজার করণীয় বিষয় কী?

৩৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত) ঃ মহাভারত-শান্তিপর্ব

বুদ্ধদেব বসু (১৯৭৪) ঃ মহাভারতের কথা, কলিকাতা এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যতীর্ষ (অনূদিত) (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) ঃ মহাভারতে শান্তিপর্ব, কলিকাতা আর্যশাস্ত্র।

সুকুমারী ভট্টাচার্য (বঙ্গাব্দ ১৩৯৪) ঃ মহাভারতের সমাজ, শান্তিনেকেতন, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি।

একক ৩৫ □ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও মুসলমান আমলের ভারতে রাজনৈতিক চিন্তা

গঠন

৩৫.০ উদ্দেশ্য

৩৫.১ প্রস্তাবনা

৩৫.২ ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

৩৫.৩ হজরত মুহম্মদ ঃ ইসলামীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

৩৫.৪ ইসলামীয় রাষ্ট্রের বিকাশ ঃ খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব

৩৫.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঃ প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন

৩৫.৬ ইসলামীয় দার্শনিকদের রচনায় রাষ্ট্র

৩৫.৭ ভারতবর্ষ ও ইসলাম

- ৩৫.৭.১ সুলতানী শাসনপর্বে রাষ্ট্র
- ৩৫.৭.২ ইসলামীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ সুলতানীপর্ব
- ৩৫.৭.৩ মুঘল শাসনপর্বে রাষ্ট্র
- ৩৫.৭.৪ মুঘল শাসিত ভারতে চরমরাজতন্ত্র গড়ে ওঠার কারণসমূহ
- ৩৫.৭.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ মুঘলপর্ব

৩৫.৮ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসকের কার্যাবলী

৩৫.৯ সারাংশ

৩৫.১০ অনুশীলনী

৩৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামীয় চিন্তায় রাষ্ট্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা। এই এককটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব তা হ'ল —

- ইসলামের উদ্ভবের আগে আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি।
- হজরত মুহম্মদের সময়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর। ইসলামীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের-ইতিহাস।

- হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের বিকাশ ও সম্প্রসারণ পর্ব এবং এই পর্বে রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামীয় দার্শনিকদের মতামত।
- ভারতে ইসলামের আগমন - সুলতানীপর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সে সময়কার দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা।
- মুঘলপর্বে রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃতি — এ সময়ের রাষ্ট্র দার্শনিকগণ কিভাবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশাসকের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন।
- ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বিষয়টিও আমাদের আলোচনায় থাকবে। এই বিষয়টির আলোচনা আজকের যুগেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক ভাবনা ও রাষ্ট্রপ্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।

৩৫.১ প্রস্তাবনা

আমাদের দেশ এক বহুজাতিক দেশ হিসেবে খ্যাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতে এসেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। কখনও বা এই প্রয়োজনের তাগিদে বহিরাগত গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। সুদূর অতীতে আর্যরা এসেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে - গড়ে তুলেছে এদেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতে বৈদিক সংস্কৃতি। এভাবেই এসেছে আরবগণ ইসলামের উদ্ভবের আগেই দক্ষিণভারতে বাণিজ্যিক কারণে, পরে দখল করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা। ইতিমধ্যে সপ্তম শতকে আরবে হজরত মুহম্মদের মাধ্যমে ইসলামের উদ্ভব ঘটেছে। আরবের বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীগুলি হজরত মুহম্মদের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে 'উম্মা' বা সমভাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়। কয়েক শতকের মধ্যেই ইসলাম পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য, তুরস্ক, ইরাণ পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ইসলাম যখন পৌঁছায় তখন সে এক রূপান্তরিত ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শন। এয়োদশ শতকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সুলতানীপর্বের (খ্রীঃ ১২০৬-১৫২৬) ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন মুঘলপর্বের (খ্রীঃ ১৫২৬ - ১৭৫৭ - ১৮৫৮) রাজনৈতিক স্থায়িত্বে পুনরায় রূপান্তরিত হ'তে থাকে।

এই এককে আমরা ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামীয় রাষ্ট্রভাবনায় এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা প্রথমে ইসলামের উদ্ভবের পূর্বের আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। হজরত মুহম্মদের সময়ে ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। এ সময়ে আরবের প্রধানত ভ্রাম্যমান পশুপালক কৌম গোষ্ঠীগুলিকে এক সমবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং ক্রমশ একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার অন্যতম কৃতিত্ব হ'ল হজরত মুহম্মদের। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম চার খলিফার সময় (খুলাফায়ে রাশেদূন এর যুগে) ইসলামীয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র ধারণার বিকাশ ঘটে। পরবর্ত্তী তিন-চার শতকের মধ্যে ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রদর্শনেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ, রাজতন্ত্রের উদ্ভব এই পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। আমাদের আলোচনায় তাই এই বিষয়গুলির উপর আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৩৫.২ ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম প্রচারক হজরত মুহম্মদ এর জন্মের (খ্রীঃ ৫৭০ ২৯শে আগষ্ট - ১২ রবিউন আউওল, মতান্তরে ৯ রবিউল আউওল) প্রাক্‌কালে আরবের রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে সময় দক্ষিণ আরব ছিল কৃষি, অর্থনীতি ও বর্হিবানিজ্যে সমৃদ্ধ, অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যও গড়ে ওঠে দক্ষিণ আরবে। যেমন সায়েবীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাবা' মিসীরগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মা আন বা মা'ঈন, কাতাবান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাতাবান রাজ্য এবং তার পাশেই হাযরামাউত রাজ্য, হিমায়ের বংশের ইয়েমেন রাজ্য। উত্তর ও মধ্য আরবেও অনেকগুলি রাজ্য গড়ে ওঠে, যেমন, জেরুজালেমের নেগেভ অঞ্চলের নেবিয়াতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পেট্রারাজ্য, সিরিয়ার মরু অঞ্চলে পালমিরা রাজ্য, পারস্য সীমান্তে হিরা রাজ্য, সিরিয়ার সীমান্তে গাসমান রাজ্য, মধ্য আরবে কিন্দা রাজ্য।

সে সময় আরবে এই রাজ্যগুলি গড়ে উঠলেও আধুনিক অর্থে এগুলিকে রাজ্য বলা চলে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কারণ, আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তার অনেক কিছুই ছিল এই রাজ্যগুলিতে অনুপস্থিত। বরঞ্চ এগুলিকে বলা চলে কৌমরাজ্য, যা আধুনিক অর্থে রাজ্যগঠনের আগের অবস্থা। সে সময় আরব ছিল বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কৌমগোষ্ঠীর মতো আরবের কৌমগোষ্ঠীগুলিও ছিল গোত্রভিত্তিক যা রক্তের বন্ধন, ভাষা ও কৌম প্রতীক হিসেবে কোনও দেবদেবীর পূজার্চনার (সে সময় কাবা গৃহের মূর্তি ছিল ৩৬০) দ্বারা আবদ্ধ থাকত। এমনকি কোনও ব্যক্তির পরিচয়ও নির্ধারিত হ'ত সেই ব্যক্তি কোন্ কৌমগোষ্ঠীর অন্তর্গত তার দ্বারা। এ কারণে নিজ কৌমগোষ্ঠীর প্রাধান্য, মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সবাই ছিল খুব সজাগ। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও কোনও গোত্রের সদস্যপদ লাভ করা যেত কোনও সম্পর্ক পাতিয়ে। এছাড়া, কোনও পরিবারের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সেই পরিবারের অধীনে ঐ গোত্রেই বাস করতে পারত। যুদ্ধবন্দীদের, বিশেষ করে নারীদের, বিবাহ করে গোত্রের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টিও ছিল স্বাভাবিক।

অধিকাংশ কৌমগোষ্ঠীই পরিচালিত হ'ত কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদ্বারা। এই গোত্রপ্রধান সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হ'তেন। অনেক সময় গোত্রান্তর্গত বংশ, বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিবেচিত হ'ত। এই গোষ্ঠীপ্রধান বা শেখ অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ বা সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। কিন্তু বিচার বা অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, গোত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বংশের প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সাধারণভাবে গোষ্ঠীপ্রধান অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে কোনও কর বা এ জাতীয় অর্থ/দ্রব্য পেতেন না। কিন্তু যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদের (যা গণীমাত নামে পরিচিত) একাংশ গোষ্ঠীপ্রধানের প্রাপ্য ছিল। এছাড়া কোনও দ্রব্য লুণ্ঠন করলেও সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ গোষ্ঠীপ্রধানের প্রাপ্য। বাকী অংশ লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ভাগ করে দেওয়া হ'ত।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বসবাসের দিক থেকে আরবগণ ছিল মূলত দু'ভাগে বিভক্ত — মরুবাসী ও নগরবাসী। উত্তর আরবে বসবাসকারী অধিকাংশই ছিল মরুবাসী; জীবিকা ছিল পশুপালন। এছাড়া

লুণ্ঠন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন-এর মতে, বেদুইনরা ছিল প্রকৃতিগত ভাবে অ-সভ্য দস্যু; কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন এবং অপরের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী। আর. এ. নিকলসনও মনে করেন, এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীপতি থাকলেও গোষ্ঠীপতির পক্ষে অন্য ব্যক্তির উপরে আদেশ জারী করা বা আনুগত্য আদায় করা ছিল অসম্ভব। এক কথায়, প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল স্বশাসিত।

এরই পাশাপাশি বাণিজ্যিক কারণে আরবে কতকগুলি নগরের উদ্ভব ঘটতে থাকে। বাইজানটাইন ও পারস্যের মধ্যে বিরোধ, নতুন বাণিজ্যপথের প্রসার প্রভৃতি ঘটনাবলীর ফলে অন্যতম বানিজ্যনগর হিসেবে মক্কা বিবেচিত হয়। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকেই ম'কোরব বানিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হতে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ তথা প্যালেস্টাইন থেকে ইয়েমেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম তথা লোহিত সাগর থেকে ইথিওপিয়া এবং পারস্য উপকূলের সঙ্গে সংযোগকারী মক্কা ছিল মূলত বাণিজ্য নগর। পঞ্চম শতকের শেষের দিকে কুরেশবংশের কুশয় নামে এক ব্যক্তি মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করেন। আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার এর মতে, এই কুশয়ই সম্ভবত সিরিয়া থেকে দেবী আল উজ্জা এবং মনাত মক্কায় নিয়ে আসেন। গল্পগাথা অনুযায়ী এই কুশয় এরই পুত্র আব্দুল মানফ-এর চার পুত্র যথাক্রমে পারস্য, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়া থেকে রওনা হন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। মক্কার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্যও কুরেশ গোষ্ঠী মূখ্য ভূমিকা নেয়। মানফের পুত্র হাশিম বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সঙ্গে ইলাফ নামে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তির শর্তে বলা হয়, বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে যে সকল গোত্র-গোষ্ঠী পড়ত তাদের প্রধানরা কুরেশদের বাণিজ্য কাফেলাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবে এবং বিনিময়ে বাণিজ্যলাভের কিছু অংশ পাবে। সিরিয়ার সম্রাটও এধরণের চুক্তি করেন যাতে বিভিন্ন লুণ্ঠনকারী গোত্রগোষ্ঠীর হাত থেকে বাণিজ্যকে নিরাপদ রাখা যায়। হজরত মুহম্মদের জীবনেও আমরা বিভিন্ন চুক্তির সঙ্গে পরিচিত হই। এ সময় মক্কায় বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত এক সভা 'আল-মালা' ছিল। সাধারণ বিষয়গুলি আলোচনার জন্য বিভিন্ন গোত্রের মানুষ কাবা প্রাঙ্গনে হাজির হত। এই কাবা একদিকে যেমন ছিল উপাসনাগৃহ, অপরদিকে ছিল সাধারণ আলোচনা ক্ষেত্র। এই সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও আধুনিক অর্থে কোনও আইন বা প্রশাসনিক সংস্থা ছিল না, কারণ প্রতিটি গোত্রই ছিল স্ব-স্বাধীন। এই ব্যবস্থাকে আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার commercial oligopoly বা বণিকগোষ্ঠী চালিত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। এই ব্যবস্থায় আদিম গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রধান। এই বাণিজ্যনগরের উদ্বৃত্ত ও সৃষ্টি হয়েছে সুদূর অঞ্চলের বানিজ্য থেকে - কোনও সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থায় থেকে নয়। একারনে সেসময় রাজতন্ত্র যা মূলত কৃষি সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত — আরবে উদ্ভুত হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে ভ্রাম্যমান পশুপালন সমাজ থেকে বাণিজ্য সমাজের রূপান্তরের পর্বে আরবে ইসলামের জন্ম। একারণে মক্কার তথা ইসলামের উদ্ভবের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অন্যান্য ধর্মের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। ওয়াট (W. Montgomary Watt) মনে করেন আরবের ধূসর মরুভূমিতে ইসলামের জন্ম নয়; বস্তুত ইসলামের জন্ম আরবের সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে। আরবের এই গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরে হজরত মুহম্মদের ভূমিকা অসামান্য।

৩৫.৩ হজরত মুহম্মদ ঃ ইসলামীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, সেসময় বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষ ছিল আরবের স্বাভাবিক ঘটনা। এধরনের ঘটনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেত বাৎসরিক কোনও সমায়ে-মেলায় উৎসব অনুষ্ঠানে। বকর গোত্রের সঙ্গে তাগলিব গোত্রের বিরোধের সূচনা হয় এক উটকে কেন্দ্র করে এবং এই বিরোধ প্রায় ৪০ বৎসর ধরে চলে। আবস গোত্রের সঙ্গে যুবীয়ান গোত্রের বিরোধ বাধে ঘোড়া ও উটের এক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এবং এই বিরোধ কয়েক দশক স্থায়ী হয়। পরস্পর বিবাদমান গোত্রগোষ্ঠীগুলিকে একত্র করে এক সংহত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে পরিণত করার অন্যতম কৃতিত্ব হ'ল হজরত মুহম্মদের। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সংঘাতকে অতিক্রম করে, একই ঈশ্বরের অধীন (সে সময় কাবা উপাসনা গৃহেই দেবদেবী মূর্তির সংখ্যা ছিল ৩৬০টি) সমভাতৃত্বে ও সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী এই নবজাগ্রত সম্প্রদায় — মুসলিম সম্প্রদায় হজরত মুহম্মদের সৃষ্টি। কুর-আন এ ঘোষিত হ'ল 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম' (৫ ঃ ৩)।

কৌম সমাজের রক্তের বন্ধন, ভাষা ও নির্দিষ্ট-গোত্রভিত্তিক দেবদেবীর পূর্জাচণার পরিবর্তে দেখা দিল নতুন ত্রিবন্ধন। (১) আল্লাহ্ তথা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হিসেবে হজরত মুহম্মদকে স্বীকার ও হজরত মুহম্মদের প্রতি আস্থা এবং (৩) আল্লাহ্ তালার ঈশীবাণী হিসেবে মুহম্মদ কথিত বাণীর (যা পরবর্তীকালে পবিত্র গ্রন্থ কুর-আন হিসেবে গ্রথিত) প্রতি বিশ্বাস। এই নবোদ্ভুত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কারণ রাষ্ট্রগঠনের উপাদানগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপাদানই এখানে অনুপস্থিত। যেমন, সমবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক কোনও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তা আবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, এই নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যভূক্তির অন্যতম শর্ত হ'ল আল্লাহতালার প্রতি বিশ্বাস; কুর-আন এবং আল্লাহ্তালার সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদের প্রতি সম্পূর্ন আস্থা। তৃতীয়ত, আল্লাহ্তালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নামে পরিচিত। একমাত্র আল্লাহ্তালা এবং আল্লাহ্র রসুল (প্রতিনিধি) হজরত মুহম্মদ প্রতিপালক হিসেবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। কুর-আন এর আয়াত, অনুযায়ী 'হে নবী, আমার বান্দার উপর তোমার কোনও আধিপত্য নেই। তোমার প্রতিপালকের আধিপত্যই যথেষ্ট (১৭ ঃ ৬৫)। চতুর্থত, আল্লাহ্তালার মুখনিঃসৃত বাণী যা হজরত মুহম্মদের কাছে ঐশীভাবে প্রকাশিত, এবং পরবর্ত্তীকালে কুর-আন হিসেবে গ্রথিত, একমাত্র আইন বা শরিয়ত। এই আইনের এমনকি একটি শব্দেরও পরিবর্তনের অধিকার কোনও ব্যক্তি বা নেতা (শেখ) ইমাম, আমির বা খলিকার নেই। এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের এই সার্বভৌম ও সার্বজনীনতার ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লেও আধুনিক রাষ্ট্রে শাসক তথা রাজা/সামরিক বাহিনীর প্রধান/আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনপ্রয়োগ, প্রচলিত আইনের সংশোধন বা বাতিলের অধিকারী, যা মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত।

অ-রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় হিসেবে ইসলামের উদ্ভব হ'লেও ইসলামের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হ'তে থাকে। এবং সম্ভবত হজরত মুহম্মদের জীবিতকালেই এই পরিবর্তনের সূচনা। বদর যুদ্ধের (মার্চ, ৬২৪ খ্রীঃ) পর হজরত মুহম্মদকে বেশ কিছু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়; যেমন, যে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নতুন ধর্ম ইসলাম-এ দীক্ষিত বা আশ্রিত হ'তে থাকে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, দীক্ষিতদের পরিচালন ব্যবস্থা, নেতৃত্বের স্বরূপ — প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। অধ্যাপক সেরওয়ানী (H.K. Sherwani) হজরত মুহম্মদের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা ইসলামীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন, ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিলে প্রথম প্রতিশ্রুতি এবং কয়েক মাস পরে মতান্তরে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আকাবা। প্রথম প্রতিশ্রুতিটি হয় খাজরাজ গোত্রের ১০ জন এবং আউস গোত্রের ১০ জন এর সঙ্গে । দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা অংশ নেয় এবং এদের মধ্যে ১২ জনকে হজরত মুহম্মদ বাছাই করেন। এই দুই প্রতিশ্রুতিতে সকলেই হজরত মুহম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা এই নতুন ধর্মকে মান্য করবে এবং প্রয়োজনে রক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। হজরত মুহম্মদের জীবনে পরবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হ'ল মদিনায় বসবাসকারী ইসলাম বর্হিভূত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর, বিশেষত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের, সঙ্গে মদিনার চুক্তি সম্পাদন করা, এই মদিনা চুক্তি নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। হজরত মুহম্মদ জিযয়ার বিনিময়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করেন তার বিষয়বস্তু 'ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ' (১৯৭৭, ১৯৮৪) গ্রন্থে শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান সংক্ষেপে তুলে ধরেন। বিষয় বস্তুগুলি নিম্নরূপ ঃ

তারা (অ-মুসলিম জনগণ), শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে মদিনা রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে।

তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।

তাদের সকল প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

তাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অধিকারে নিরাপত্তা থাকবে

তাদের ধর্ম, ধর্মযাজক, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোনও ক্ষতি করা হবে না বা তাদের ধর্মপালনে বাধাদানও করা হবে না।

তাদের কোনও অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না।

তাদের উদ্দ্যেশ্যে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না।

তাদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক নয়।

ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

তাছাড়া বাণিজ্যিক কারণে হজরত মুহম্মদকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যেমন খ্রীষ্টীয় রাষ্ট্র নজরান, ইহুদী রাষ্ট্র ইয়াথরিব এবং হিসার সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসতে হয়। পূর্বে ইরান, পশ্চিমে পূর্বরোম সাম্রাজ্য এবং আবেসিনিয়ার সঙ্গে আরব বণিকদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ভারতের সঙ্গেও আরবের বানিজ্যিক

সম্পর্ক ছিল। খাদিজার বানিজ্যিক প্রতিনিধি হিসেবে হজরত মুহম্মদকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কে ধারণা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। এ'সমস্ত অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালে ইসলামীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি ও পরিচালনায় সহায়ক হয়।

ইসলামের রাষ্ট্রভাবনায় আল্লাহতালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং হজরত মুহম্মদ হলেন তারই প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর। কুর-আন অনুযায়ী হজরত মুহম্মদের সার্বভৌম ক্ষমতা দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত তিনি আইনের রক্ষাকর্তা - সৃষ্টিকর্তা নন। তিনিও সাধারণ মুসলিমের ন্যায় শরিয়তের অধীন। তিনি ইসলাম ও বিশ্বাসীদের রক্ষক - প্রভু নন। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শরীয়তের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহতালার নবীরই সার্বভৌমত্ব। আইনের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে তিনি সার্বভৌম সমাজের তথা রাষ্ট্রেরও রক্ষাকর্তা। রাজনৈতিক সামাজিক, সামরিক ক্ষমতার তিনিই অধিকারী। যুদ্ধপরিচালনা ও শান্তিস্থাপনের বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত। বিভিন্নধরণের কর (যেমন অ-মুসলমানদের উপর জিযয়া এবং মুসলমানদের উপর খারাজ) ধার্য করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ধর্মীয় ব্যাপারেও তিনিই প্রধান। নামাজ পরিচালনা করা তাঁর দায়িত্ব। এককথায়, হজরত মুহম্মদ ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রস্বরূপ। কুর-আন যেমন ঘোষণা করেছে "আল্লাহ-ব্যতীত কারো আদেশ বা অধিকার নাই" (১২ ঃ ৪০) একইভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে "আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য-কর" (৪৭ ঃ ২০-২২)। বার বার বলা হয়েছে "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে (রসুলকে) মান্যকর"। "যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য করে তাদের জন্য বেহেস্তের শান্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে (৪ ঃ ১৩-১৭)। "যারা মান্য করে না তারা নরকের আগুনে দগ্ধ হবে "(৩৩ ঃ ৩৬)। হুসেনীর (S.A.Q Husaini) মতে। 'অনেক বিতর্কিত বিষয়ে রসুলের নির্দেশ কুর-আনের ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায় কিন্তু কুর আন তদনুরূপভাবে নির্দেশকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

ইসলামে দীক্ষিত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির পরিচালনার জন্য হজরত মুহম্মদ এক প্রশাসনিক পরিকাঠামোও গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন কাজের পরিচালনার জন্য কয়েকজন সহকারীকে নিয়োগ করেন। যেমন আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত বাণী সংকলনের জন্য তিনি কয়েকজন সহকারীকে নির্দ্দেশ দেন। যাকাতও যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের হিসেব ও সংরক্ষণের জন্য কয়েকজন সচিব নিয়োগ করেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা, বিভিন্ন পত্রের মুকাবিলা করা, মহানবীর সিল সংরক্ষণ করা, প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের ভার থাকত তাঁরই একান্ত বিশ্বস্ত অনুগত সহকারীদের উপর।

মদীনা ও পাশাপাশি এলাকাগুলির শাসনকার্য হজরত মুহম্মদ নিজেই পরিচালনা করতেন। অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে বিশেষত যে অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, পরিচালনার দায়িত্ব থাকত তাঁরই বাছাই করা ওয়ালী বা প্রশাসকের উপর। ইসলামের প্রসার, কর আদায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি কাজ-পরিচালনার দায়িত্ব থাকত এই সমস্ত প্রশাসকদের উপরে। এই সমস্ত প্রশাসক নিয়োগ ছাড়াও হজরত মুহম্মদ ছোট ছোট অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের পরিচালনার জন্য এক একজন করে আমিন নিয়োগ করতেন।

এই নতুন উম্মা (সুমেরীয় ভাষা উম থেকে আগত যার বুৎপত্তিগত অর্থ 'মা'; প্রচলিত অর্থ, সম্প্রদায় বিশেষ) পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য হজরত মুহম্মদ রাজস্বের উৎস

হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে ধার্য করেন - (১) গাণীমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত, (২) যাকাত-মুসলমানদের উপর ধার্য কর (৩) জিযয়া - অ-মুসলিমদের উপর ধার্য কর (৪) খারাজ বা ভূমি রাজস্ব এবং আল-ফাই বা সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি।

উপরোক্ত উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বন্টনব্যবস্থাও ছিল সুনির্দিষ্ট। যেমন গাণীমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের $^{১}/_{৫}$ অংশ মহানবীর জন্য রেখে বাকী $^{৪}/_{৫}$ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে মর্যাদা অনুসারে বন্টন করে দেওয়া হ'ত। এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ইসলাম-পূর্ব আরবের রীতিই লক্ষ করি। যাকাত শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ধার্য কর। প্রত্যেক অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানকেই খাদ্যশস্য, গৃহপালিত জন্তু, সোনারূপার মত মূল্যবান ধাতু, বানিজ্যদ্রব্য ও খনিজসম্পদের এক নির্দিষ্ট অংশ কর হিসেবে দিতে হত। জিযয়া ছিল অ-মুসলমান প্রজাদের উপর ধার্য কর। ইসলামের উদ্ভবের আগেও পারস্যের সাসানী সম্রাটগণ আশ্রিত জনগোষ্ঠীর উপর গেজিৎ (Gezit) এবং রোমান সম্রাটগন ট্রাইবিউটাম ক্যাপিটিস (Tributum Capitis) নামে কর ধার্য করতেন। বিনিময়ে সম্রাটগণ আশ্রিত প্রজাদের নিরাপত্তা র বিধান করতেন। হজরত মুহম্মদ কর্তৃক ধার্য জিযয়া করের মধ্যে ও এই প্রাচীন প্রথার প্রয়োগ দেখা যায়। খারাজ ধার্য করার ব্যপারেও পারস্য (খারা গ- Kharag) এবং রোমান সাম্রাজ্যের (Tributam soli) প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। জিযয়া ও খারাজ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব মূলত সামরিক খাতেই ব্যয় করা হ'ত এবং এই কর ধার্যের পর থেকেই নিয়মিত ও নির্ধারিত বেতনপ্রাপ্ত প্রাপ্ত সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আল ফাই বা সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি (বেশীর ভাগই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত) মহানবীর পরিবারবর্গ এবং অনাথ গরীব দুঃখীদের জন্য ব্যয় করা হ'ত। এভাবে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উদ্ভুত ইসলাম সম্প্রদায় বা উম্মা রাজস্ব ধার্য, প্রতিষ্ঠিত সেনা বাহিনী, প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের দিকেই এগুতে থাকে।

৩৫.৪ ইসলামীয় রাষ্ট্রের বিকাশ ঃ খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ ৭ই জুন) পর ক্রমান্বয়ে যে সময়ে চারজন খলিফা ইসলামীয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বভার নেন সেই যুগকে (খ্রীঃ ৬৩২ থেকে খ্রীঃ ৬৬১) ইসলামের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদূণ' এর যুগ বলা হয়। এই যুগেই ইসলামীয় সম্প্রদায় ইসলামীয় রাষ্ট্রের রূপ পায়। আল্লাহতালার প্রতিনিধি হিসেবে হজরত মুহম্মদই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগকারী ছিলেন। কিন্তু হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর কে সেই ক্ষমতার অধিকারী হবেন অর্থাৎ নেতা বা ইমাম নির্ধারণ নিয়ে সংকট দেখা দেয়। ইসলাম উম্মার গোড়াপত্তন যেহেতু মদিনায় ঘটেছে সেহেতু মদিনাবাসীগণ (আনসারী বা মুহম্মদের সাহায্যকারী) নিজেদের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচনে পক্ষপাতী। অন্যদিকে মক্কা থেকে আগত মুসলমানগণ (মুজাহির নামে পরিচিত) হজরত মুহম্মদেরই গোত্রের অর্থাৎ কুরেশ গোত্র থেকে কাউকে নির্বাচনে ইচ্ছুক। এ নিয়ে বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন হজরত মুহম্মদেরই সহকারী হজরত ওমর ইসলাম রাষ্ট্রের পরিচালনার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে আবুবকর এর নামে ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা সকলে মেনে নেন। পরবর্ত্তীকালে খলিফা আবুবকর মৃত্যুশয্যায় হজরত ওমরকে পরবর্ত্তী খলিফার জন্য মনোনীত করেন। সুতরাং বলা যায় প্রথম দু'জন খলিফাই হলেন একক ব্যক্তি দ্বারা মনোনীত এবং কুরেশ বংশজাত। কিন্তু হজরত ওমর

মৃত্যুকালে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট এক নির্বাচক মন্ডলীর ওপর খলিফা নির্বাচনের ভার দিয়ে যান। এদের মধ্যে আবদুর রহমান অপর পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করে হজরত ওসমানকে তৃতীয় খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। চতুর্থ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হ'ল হজরত আলী। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান এর অকর্মন্যতা, পক্ষপাতিত্ব, দুষ্কৃত কর্মের প্রতিশোধ হিসেবে ওসমানকে হত্যাকরে হত্যাকারীগণ হজরত আলীকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। এর পর থেকেই খলিফা পদটিকে ঘিরে ইসলামের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তথা ইসলামীয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আদায়ের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান এর মতে, ওসমানের হত্যাকান্ডের পর খিলাফত নিয়ে গৃহযুদ্ধের যে সূচনা হয় তা আর বন্ধ হয়নি এবং খিলাফতকে কেন্দ্র করে যত বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মুসলমান মুসলমানে ততবড় যুদ্ধ আর কোন কারণে সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার এই পর্বে খিলাফত পদটি এক প্রতিষ্ঠানিক আকার লাভ করে এবং ইসলামীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রচিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আক্ষরিক অর্থে খিলাফত বলতে উত্তরাধিকারী বোঝায়। এই শব্দটি মানুষ, নেতা, শাসক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরে আরবে খিলাফত শব্দটি যখন এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে তখন শব্দটি দ্বারা ঈশ্বরের নবীর অর্থাৎ হজরত মুহম্মদের উত্তরাধিকারী হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আবুবকর নিজেকে খলিফা হিসেবে অর্থাৎ হজরত মুহম্মদের উত্তরাধিকারী অর্থেই ব্যবহার করেন, কুর-আন এও একাধিকবার (ছয়বার) খলিফা শব্দটির ব্যবহার আছে মূলত এই অর্থেই। আবুবকর আবার নিজেকে ইমাম হিসেরেও উল্লেখ করেন এবং ইমাম হিসেবে তিনি সংঘবদ্ধ উপাসনায় খুৎবা ঘোষণাকারী প্রধান ব্যক্তি। আবুবকরের পর হজরত ওমর যখন খলিফার স্থলাভিবিক্ত হন তখন তিনি নিজেকে খলিফা বা ইমাম ছাড়াও আমীর-উল-মুমিনিন (অর্থাৎ নেতা বা সামরিক বাহিনীর প্রধান) উপাধি ব্যবহার করেন। এভাবে খলিফা (সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী নেতা) ইমাম (ধর্মীয় নেতা) এবং আমীর-উল-মুমিনিন (সামরিক ও প্রশাসনিক প্রধান) — এই তিনটি পদ একই ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠে এবং খলিফা একই সঙ্গে সম্প্রদায় গত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন।

তৃতীয়ত, সার্বভৌম হিসেবে খলিফা প্রশাসনিক, ধর্মীয়, বিচার বিষয়ক ও সামরিক সংক্রান্ত ক্ষমতার প্রধান হলেও তত্ত্বগতভাবে আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা সীমিত। আল্লাহতালা কর্তৃক হজরত মুহম্মদের নিকট প্রেরিত বাণীই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইনের একমাত্র উৎস। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর এই বাণীগুলিকে সংগ্রহ ও সংকলিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম খলিফা আবুবকর এর আমলে তারই নির্দেশে এবং ওমরের প্রস্তাবক্রমে বহু বিজ্ঞজনের সহায়তায় এই বাণীগুলিকে সংকলিত করা হয় এবং যা গ্রন্থ হিসেবে কুর-আন এর রূপ পায়। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে আল্লাহতালার যে সমস্ত নির্দেশ হজরত মুহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্রথিত না করে কাঠামোগতভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া, বাছাইকরণ ও হয়। ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় হজরত মুহম্মদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অনুসৃত পথ আইনের মর্যাদা পায়। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কুর-আন এর ভাষ্য হিসেবে বিভিন্ন হাদীশ গ্রন্থও রচিত হতে থাকে। এই সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলিই প্রধান

ভূমিকা নেয়। এম. এল. রায়চৌধুরীর মতে, দুঃখজনক ঘটনা হল, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারগণ নবীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সারমর্ম বা ভাবের চেয়ে কাঠামোর (form) উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এর ফলে এই ব্যাখ্যা ইসলামের মুক্ত ও চলমান প্রগতির এক আভ্যন্তরীণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে বংশ বা গোত্রের বিষয়টি এক মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র হজরত মুহম্মদের বংশ কুরেশ বংশ থেকেই খলিফা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এর ফলে খলিফার উপর আরবের বনিকগোষ্ঠীর চাপ বাড়তে থাকে। তাছাড়া খলিফা নিয়োগে বংশ বা গোত্রের বিষয়টি পরবর্ত্তীকালে বংশানুক্রমিক খলিফাতন্ত্রের জন্ম দেয়।

পঞ্চমত, নবীর সঙ্গে খলিফার গোত্রের সম্বন্ধ থাকায়, খলিফা আরব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী হওয়ায় এবং যেহেতু কুর-আন আরবী ভাষাতেই গ্রথিত সেহেতু অচিরেই আরববাসীদের কাছে ইসলাম এক জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ইসলামের সম্প্রসারণে অন্যরাজ্য অধিগ্রহণ, ইসলামীকরণ, আরবীয়করণ-এসমস্তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটতে থাকে।

৩৫.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঃ প্রকৃতিগত পরিবর্তন

আমরা এর আগের আলোচনায় দেখেছি হজরত মুহম্মদের মদিনাগমন ও বদর যুদ্ধের পরের সময়ে ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা হলেও হজরত মুহম্মদের জীবিতকালে ইসলাম ছিল মূলত সম-ভাতৃত্বে বিশ্বাসী এক ধর্ম সম্প্রদায় মাত্র। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরবর্ত্তী চারজন খলিফার যুগে একদিকে যেমন খলিফাতন্ত্রের প্রসার ঘটে, অপরদিকে সামরিক প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে খলিফার হাতে। এভাবে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর মৃত্যুর (৬৬১ খ্রীঃ) পর খলিফাতন্ত্র উমাইয়া গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে আসে। উমাইয়া গোষ্ঠীপ্রধান মুরাবীয়া তার জীবদ্দশাতেই নিজ পুত্র ইয়ামীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীও স্থানান্তরিত হয় দামোস্কে। উমাইয়া খিলাফত ৬৬১ খ্রীঃ থেকে ৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই সময়পর্বে যে ১৪ জন উমায়াদ খলিফা হন তাঁরা ছিলেন মক্কার ধনী বনিকশ্রেণীর অন্তর্গত। ইসলামের ভাতৃত্বের সম্প্রদায় এর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ক্রমশঃ প্রধান হয়ে ওঠে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উমাইয়া তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয়গণ ৭৫০ খ্রীঃ খিলাফত অধিকার করেন এবং রাজধানী বাগদাদ এ স্থানান্তরিত হয়। ১২৫৮ খ্রীঃ হালাগুখান তাতার আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিমকে হত্যা করে আব্বাসী বংশের খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটান। ইতিমধ্যে ৯০৯ খ্রীঃ মিশরে ও উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীগণ শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা ১১৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ৭৫০ খ্রীঃ উমাইয়া খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটলেও উমাইয়াদের একটি শাখা ক্ষমতা বলে স্পেন দখল করে স্বাধীন উমাইয়া খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই খলিফাতন্ত্র ১০৩১ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৫১৭ খ্রীঃ তুর্কী সুলতান সেলিম (প্রথম) মিশর অধিকার করে কায়রোয় নাম মাত্র খলিফা আব্বাসী বংশের আহম্মদকে বন্দী করে খলিফাপদ লাভ করেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও চিন্তাচেতনা ও পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমত, ইসলামের ভ্রাতৃত্বের সম্প্রদায় এর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই ক্রমশ প্রকট হতে থাকে যা ইসলামের মূল ভাবধারার বিরোধী। দ্বিতীয়ত, খলিফাপদের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখলের জন্য অর্ন্তকলহ ও অন্তর্ঘাত তীব্রতর হতে থাকে। একই উম্মা বা ইসলামীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিবর্তে একাধিক খলিফার এবং খলিফাতন্ত্রের সৃষ্টি ঘটতে থাকে। তৃতীয়ত, আরব ভূখন্ড থেকে অন্যান্য অংশে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটায় অন্যান্য অংশের ইসলাম সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কি হবে সে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অন্যকোনও অঞ্চলের মুসলিম শাসক কি আরবের খলিফাকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে আনুগত্য দেখাবে? নাকি, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন থাকবে? সমবিশ্বাসীদের মধ্যে একই ঈশ্বর (আল্লাহতালা) এক নবী (হজরত মুহম্মদ) এক ধর্মগ্রন্থ (কুর-আন) এবং একই কেন্দ্রীয়শক্তি (খলিফাতন্ত্র) ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। হাদীস গ্রন্থে বলা হ'ল, ''যদি দুজন খলিফা থাকে তাহলে অবশ্যই একজন মৃত্যু বরণ করবে''। এর মধ্যে দিয়ে এক অবিভক্ত আনুগত্যকেই স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি এ-কথাও বলা হ'ল —। ''শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে সে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে কিন্তু জনগণ তাকে মান্য করে চলবে' (আবু ইউসুফ)। বাস্তবেও দেখা যায় আরব ভূখন্ডের বাইরে বেশ কিছু ইসলাম অনুসরণকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্রপ্রধান এমনকি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও খলিকার কাছ থেকে বৈধতার স্বীকৃতি আদায় করেন। খলিফাও 'আমির উল-ইসলাম' নায়েব-উল-খলিফা প্রভৃতি উপাধি বিতরণের মাধ্যমে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির শাসকের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানের মাধ্যমে বস্তুত সেই রাষ্ট্রের শাসকের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেন। খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য হল — (১) ইসলামীয় রাষ্ট্রের বা বলা ভালো ইসলামীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের এক রাষ্ট্র হিসেবে বৈধতা লাভ করা, (২) মুসলমান নাগরিকের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত আদায় করা। কারণ খলিফার প্রতি আনুগত্য শাসকের ইসলামের প্রতি হজরত মুহম্মদের প্রতি, কুর-আন এর প্রতি আনুগত্যকে প্রমাণ করে।

চতুর্থত, ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নব অর্জিত রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত ইসলামের প্রকৃতি ও ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও চিন্তাবেদনার এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপকে ঘাঁটি করে ইউরোপ ভূখন্ডে মুসলমানেরা আক্রমন চালায় ও সিসিলি দখলের মাধ্যমে বহিঃ বিশ্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগকে ছিন্ন করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যেখানে তথাকথিত অন্ধকারময় যুগের সূচনা আরব সংস্কৃতির তখন সূবর্ণ যুগের সূত্রপাত। ক্ষয়িষ্ণু রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইনবিধি সম্প্রসারিত ইসলামের কাছে রাজনীতির এক খনি হিসেবে দেখা দেয়। রোমান প্রতিষ্ঠানগুলির ইসলামীকরণ ঘটতে থাকে। পারস্যজয়ের পর পারস্যের রাজদরবারের প্রাতিষ্ঠানিকতা, আচার, অনুষ্ঠান, আনুগত্যের নীতি ক্রমশ ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থান পায়। আব্বাসীয় পর্বে আরবের ভারতে রাজনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমত, জাতক কথা, উপনিষদসমূহ আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। এমনাকি ভারতীয় পন্ডিতদের একাধিক দল বাগদাদে গিয়ে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা অল মসুরের দরবারে গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা আলোচনা করেন। শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনই নয় গ্রিক দর্শনও এসময় আরবে বিকাশলাভ করে। অন্যান্য

অনেক কারণের মধ্যে এসমস্ত ঘটনাগুলি সূফিবাদের উদ্ভব ও প্রসারে সাহায্য করে। এভাবে রোমান, পারসিক, ভারতীয়, গ্রিক দর্শন ইসলামীয় দর্শনও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় এক ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব আমরা লক্ষ করি বিশেষভাবে খলিফা হারান ও মামুনের আচার ব্যবস্থায় এবং ইবনে আবীর রবি (খ্রীঃ ৮৬০ খ্রীঃ ৯৪০), অল ফারাবি (খ্রীঃ ৮৭০-৯৫০), অল মওয়ার্দি (খ্রীঃ ৯৭৪-১০৫৮), নিজামূল মুলুক অল তুসি (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯১), ইমাম গজ্জালি (খ্রীঃ ১০৫৮-১১১১) ইবনে খালদুন (খ্রীঃ ১৩১২-১৪০৬) প্রমুখ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের রচনায়। এছাড়াও আবু হানিফ, মালিক, সাফি, হানবল প্রমুখ ইমামের ব্যাখ্যায় ইসলামীয় আইনের ও রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ হতে থাকে।

৩৫.৬ ইসলামীয় দার্শনিকদের রচনায় রাষ্ট্র

ইসলামের সম্প্রসারণের ফলে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে গতানুগতিক ইসলামীয় ব্যবস্থাকে সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারটি ছিল নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ। যেমন কুর-আন-এ রাজতন্ত্রের ব্যাপারটির উল্লেখ না থাকলেও আবির রবি (৮৬০ - ৯৪৯ খ্রীঃ) রাজতন্ত্রের সমর্থনে এই মত প্রকাশ করেন, ''আল্লাহর এটাই ইচ্ছা যে জনগনকে সংগঠিত করা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ঈশ্বরের বিধানকে ঠিকমতো বলবৎ করার বিষয়টি দেখাশোনার জন্য সমাজের একজন প্রধানব্যক্তি নিযুক্ত হবেন''। আল ফারাবি (খ্রীঃ ৮৭০-৯৫০) রাজতন্ত্রকে শুধুমাত্র সমর্থনই করেননি রাজাকে ঈশ্বরের মতোই প্রধান ও দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন সর্বশক্তিমান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেন। নিজামুল মুলুক 'শিয়ামতনামা' গ্রন্থে রাজতন্ত্রকে এভাবে বৈধতাদান করেন -'' সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে বাছাই করেন ও তার ওপর জগতের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভার অর্পন করেন এবং মানবজাতির স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির প্রয়োজনে শাসন ক্ষমতাও অর্পন করেন''। ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম তাত্ত্বিক ইমাম গজ্জালি (১০৫৮-১১১১খ্রিঃ) রাষ্ট্রের বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাষ্ট্রকে এক বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রসৃষ্টির আগে সমাজ ছিল অরাজকতা, আভ্যন্তরীন কলহ ও বিরোধপূর্ণ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির শাসন প্রয়োজন। কিন্তু কোন শাসকদ্বারাই এরকম অবস্থায় স্থায়ীসংগঠন গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। একমাত্র ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করেই সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। সুতরাং সুলতান বা শাসক রাষ্ট্র পরিচালনায় ঈশ্বর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলবেন। এভাবে গজ্জালি রাজনীতিকে ধর্মীয় বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

মধ্যযুগের ইসলাম জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (খ্রীঃ ১৩১২-১৪০৫) রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করেন। (এক) তাবিয়ী রাষ্ট্র বা স্বাভাবিক রাষ্ট্র এবং (দুই) সিয়াসী রাষ্ট্র বা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র। শাসক শুধুমাত্র ক্ষমতা বলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও পরিচালনা করে সে রাষ্ট্র হল তাবিয়ী রাষ্ট্র। সিয়াসী রাষ্ট্র হল বিধিবদ্ধ বা আইনের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। এই সিয়াসী রাষ্ট্রকে খালাদুন আবার দুভাগে ভাগ করেন - (এক) সিয়াসী আকলীয়া বা যুক্তিগ্রাহ্য বিধিবদ্ধ এবং (দুই) সিয়াসী দীনিয়াহ বা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র। ইসলামীয় রাষ্ট্র হল এই শেষ প্রকারের রাষ্ট্র অর্থাৎ সিয়াসী দীনিয়াহ বা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে যে খলিকাতন্ত্রের প্রসার ঘটে ইবনে খালদুন সেই খলিফাতন্ত্রকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলেন। ইবনে খালদুনের মতে, খিলাফত হল এমন প্রতিষ্ঠান যা হজরত মুহম্মদের আদর্শ ও লক্ষ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। খলিফার প্রধান কর্তব্য হ'ল ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতিকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রন করা। খালদুন 'মুকদ্দিমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন দুটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা হ'ল গোষ্ঠী চেতনা ও ধর্মীয় চেতনা।

অল মওয়ার্দী, অল গজ্জালি প্রমুখ দার্শনিকগণ খিলাফতের জন্য কুরেশ বংশের প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে খালদুন খলিফার পদটিকে শুধুমাত্র কুরেশ বংশের মধ্যে আবদ্ধ না করে সময় বিশেষে এর ব্যতিক্রমকেও সমর্থন করেছেন। খারেজীগন ও খিলাফতকে কোনও বংশের একচেটিয়া বলে মনে করেননি। এমনকি যোগ্যতা থাকলে একজন মহিলাকেও তাঁরা খলিফা বা ইমাম হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শনের আর এক তাত্ত্বিক অল-মওয়ার্দী খিলাফত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান অল-মওয়ার্দীয় মতকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেন 'ইমলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ' (১৯৭৭, ১৯৮৪) গ্রন্থে। মওয়ার্দী খিলাফত পদটিকে বংশানুক্রমিক করার পরিবর্তে নির্বাচনমূলক বলে অভিহিত করেন। এমনকি তিনি খিলাফত পদপ্রার্থী হওয়া এবং নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্তের ও উল্লেখ করেন। যেমন খলিফা পদপ্রার্থী হতে গেলে তিনি ৭টি গুণের অধিকারী হবেন— কুরেশবংশজাত, পুরুষ, পূর্ণবয়স্ক, চরিত্রবান। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি মুক্ত, বেসামরিক শাসনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্য, কুর-আন ও হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী এবং মুসলমান ভূখন্ডের নিরাপত্তার জন্য সাহসী। খলিফার নির্বাচক মন্ডলীর যোগ্যতার বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেন। প্রথমদিকে কেবল মহাবীদের (হজরত মুহম্মদের সহচরদের) এই ক্ষমতা ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী পর্যায়ে যাদের আইন বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান রয়েছে এবং যারা তাদের ধর্মপরায়ণতা ও যোগ্যতার জন্য খ্যাত তারাই খলিফার নির্বাচনের যোগ্য। যদি এই নির্বাচকমন্ডলী কোনও অযোগ্যব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন' তাহলেও তাদের এই নির্বাচন চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। ইবনে জামায়া অবশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফত পদপ্রাপ্তির পাশাপাশি ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে খিলাফত পদপ্রাপ্তির বিষয়গুলিকে আলোচনায় আনেন। জামায়ার মতে, ক্ষমতাবলে যদি কেউ খলিফাপদ দখল করে এবং তারপর অন্যকোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক সেই খলিফা পদচ্যুত হয় তাহলে দ্বিতীয়জনকেই খলিফা হিসেবে মানতে হবে। এব্যাপারে তিনি খলিফা ওমরের বক্তব্য তুলে ধরেন — 'আমরা সব সময় বিজেতার পক্ষে'।

খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অল মওয়ার্দীর বক্তব্য হল, খলিফাকে ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে, অর্ধমাচরণ দমন করতে হবে, আইন এর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিবাদ মীমাংসা করতে হবে। রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করা, ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া, ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, ঘোষণা করা, গাণীমত ও জিযয়া সংগ্রহ করা ও উপযুক্তভাবে বন্টন করা, যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা প্রভৃতি কাজগুলিও খলিফার অন্যতম কাজ।

ইসলাম রাষ্ট্র দার্শনিকগণ ইসলাম ধর্মের উপর রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে যেমন মতপ্রকাশ

করেন, রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মের নতুনতর ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন, ইমাম গজ্জালি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যুক্তিতর্কের পরিবর্তে ঈশ্বরিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইবনে তাইমিয়া (খ্রীঃ ১২৬৩-১৩২৮) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যবহার অত্যন্ত আদর্শ কাজ। কারণ, তা আল্লাহতালার নৈকট্যলাভে সহায়ক হয়। এই নৈকট্যলাভের অর্থই হ'ল, আল্লাহও তার রসুলকে মান্য করা। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান এব্যাপারে মন্তব্য করেন, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে খিলাফত প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্ত্তী কোনও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই জন্মলাভ করে। পরবর্ত্তীকালে মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ শরিয়তের সাথে রাজনৈতিক কাঠামোকে এক পর্যায়ে ফেলে খলীফার সঙ্গে ইহলৌকিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের সমন্বয় সাধন করেন এবং খলিফাকে আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করেন। সেই জন্যই বলা যায় যে, "ইসলাম রাষ্ট্রকে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছে — সে উদ্দেশ্য হ'ল মানব সমাজকে ইসলামে দীক্ষিত করা" (ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ (১৯৭৭, ১৯৮৪) পৃঃ ১৯১)। ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের পরিপেক্ষিতেই ইসলামীয় তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করেন— দার-উল-ইসলাম এবং দার-উল-হারব। দার-উল-ইসলাম হল সেই রাষ্ট্র যা ইসলামীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত এবং দার-উল-হারব হ'ল যে রাষ্ট্রে ইসলামের অনুশাসনগুলি অনুসৃত হয় না বা বলা চলে বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত রাজ্য।

৩৫.৭ ভারতবর্ষ ও ইসলাম

ভারতের সঙ্গে আরবের যোগাযোগ ইসলামের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই। ভারতের বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ অনেকদিনের এবং তা ইসলামের উদ্ভবের আগে থেকেই। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মশলা প্রধান দ্বীপগুলির সঙ্গে, ভারতের রেশম ও তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতি কেনা বেচার জন্য আরব বণিকগণ শুধুমাত্র বাণিজ্য কুঠি নয়, স্থায়ীভাবে বসবাস ও শুরু করেন। দক্ষিণভারতের শাসকগণ ও আরব বণিকদের নিরাপত্তা ও বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন। আরবে ইসলামের উদ্ভব, বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্রগুলির ইসলামে দীক্ষিতকরণ স্বাভাবিকভাবেই ভারতে বসবাসকারী আরববাসীদের ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী করে তোলে। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিল এসময় গৌণ। তবে ভারতের ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ আবর শাসকদের ভারত অভিযানের বিষয়ে উৎসাহী যে করেনি তা নয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময়ে বা ৬৬০ খ্রীঃ চতুর্থ খলিফা আলীর সময়ে সিন্ধু এলাকায় অভিযান চালানোর প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয় বা ৬৬৪ খ্রীঃ প্রথম উমায়াদ খলিফার মুরাবিয়ার সময়েও এই প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ৭১১ খ্রিঃ মুহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃকসিন্ধু বিজয় এবং তার পরেও বিভিন্ন সময়ে ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে অভিযান চললেও স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১২০৬ খ্রীঃ। এসময় অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীঃ মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে কুৎবউদ্দীন আইবক নিজেকে ভারতের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি দিল্লীতে যে সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন তা ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই পর্যায়কে ভারতের ইতিহাসে সুলতানী পর্ব বলে। ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথমযুদ্ধে শেষ লুদী সুলতান ইব্রাহিম লুদীকে পরাজিত করে বাবুর দিল্লীর সিংহাসন দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৪০ থেকে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে সুরীবংশের শাসকপর্বটিকে বাদদিলে ১৫২৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ

পর্যন্ত এই মুঘল সাম্রাজ্য বজায় থাকে। আমরা এই পর্বদু'টি আলাদা ভাবে আলোচনা করব।

৩৫.৭.১ সুলতানীশাসন পর্বে রাষ্ট্র

ভারতে সুলতানী শাসনের যুগ হ'ল ১২০৬ খ্রীঃ থেকে ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এবং সুলতানগণ জাতিতে ছিলেন তুর্কী। ভারতে সুলতানীপর্বে পাঁচটি বংশ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বংশগুলি হল যথাক্রমে মামলুক বা দাস বংশ (খ্রীঃ ১২০৬-১২৯০) খলজীবংশ (খ্রীঃ ১২৯০-১৩২০) তুঘলক বংশ (খ্রীঃ ১৩২০-১৪১৪) সৈয়দ বংশ (খ্রীঃ ১৪১৪-১৪৫১) ও লোদীবংশ (খ্রীঃ ১৪১৫-১৫২৬), সুলতানী শাসনপর্বে রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে সমস্ত ব্যবস্থা ও ধারণাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে তা নিম্নরূপ।

প্রথমত, সুলতানী শাসকগণ ভারতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়নি। পরিবর্তে ছিল আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিরোধেপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সুলতানী শাসকগণ স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও অধিকাংশ সুলতানই খলিফার কাছ থেকে বৈধতা আদায়ে সচেষ্ট হন। সুলতান মামুদ, মামুদের পুত্র মামুদ আব্বাসী খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুহম্মদ ঘুরী ও তার ভাই গিয়াসউদ্দীন খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে নিজেকে নাসীর আমির-উল-মুমিনিন ও নসর-উদ-দুনিয়া বলে ঘোষণা করেন। এমনকি, খলিফা মুসতাসিম এর মৃত্যুর পরেও প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দিল্লীর সুলতানগণ মুসতাসিম এর নাম মুদ্রায় উল্লেখ করেন। আলাউদ্দিন খলজী, মুহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ প্রভৃতি শাসকগণ ও খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেন। এই প্রথার একমাত্র ব্যতিক্রমী হলেন কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ যিনি খিলাফতের আধিপত্যকে অস্বীকার করে দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। এমনকি তিনি নিজেকে প্রধান ইমাম, খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। ১৩১৭ খ্রীঃ থেকে তাঁর মুদ্রাতেও নিজের নাম উল্লেখ ও খলিফা উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। শুধুমাত্র ভারতে কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহই নয়, ভারতের বাইরেও অনেক শাসকই খলিফার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত ১২৫৮ খ্রীঃ আব্বাসীদের পতনের পর থেকে খলিফাতন্ত্রের গুরুত্ব কমতে থাকে।

তৃতীয়ত, সুলতানী শাসকগণ রাজতন্ত্র গড়ে তুললেও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে সবসময় রক্ষা করতে পারেননি। শাসক বাছাইএর ব্যাপারেও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সামরিক ক্ষমতা , শাসনকার্যে দক্ষতা, শাসক কর্তৃক পরবর্ত্তী শাসককে বাছাই করা, গোষ্ঠী-প্রধানদের কর্তৃক বাছাই করা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। অধ্যাপক আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, রাজতন্ত্রের ধারণায় খলজী শাসকদের দুটি অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (এক) রাজতন্ত্র কোনও গোষ্ঠী বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পত্তি নয়। ক্ষমতা ও দক্ষতাই হল রাজতন্ত্রের ভিত্তি। (দুই) ধর্মীয় অনুমোদন ছাড়াই রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব।

চতুর্থত, সুলতানী শাসন ছিল একান্তভাবেই পুরুষ শাসিত। ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে মনোনীত করে গেলেও আমীরগণ একজন মহিলার শাসন মানতে অস্বীকার করে রুকনউদ্দীনকে সিংহাসনে বসান। পরে অবশ্য রাজিয়া গৃহযুদ্ধে জয় লাভ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, সমর কৌশল, বিদ্যোৎসাহীতা প্রভৃতি গুণাবলীর কোনটারই অভাব ছিল না। তথাদি তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের চক্রান্ত শুরু হয় এবং সেই চক্রান্তে ১২৪০ খ্রীঃ সুলতানা রাজিয়া প্রাণ হারান। সুতরাং বলা যায় সুলতানী

রাষ্ট্র ছিল একান্তভাবেই পুরুষতান্ত্রিক।

৩৫.৭.২ ভারতে ইসলামীয় রাষ্ট্রদার্শনিকের আলোচনায় রাষ্ট্রঃ সুলতানীপর্য

ইসলামের উৎসস্থল আরবভূখন্ড থেকে ইসলাম আরবের বাইরের দেশগুলিতে কয়েক শতকের মধ্যেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। আরবকেন্দ্রিক ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব বিদেশের মাটিতে রূপান্তরিতও হতে থাকে। এই সম্প্রসারণে ও রূপান্তরের যুগেই ইসলাম ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। অষ্টম বা দশম শতকের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে এয়োদশ শতকে ভারতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানী শাসন (১২০৬ - ১৫৫৬ খ্রীঃ)। এই সুলতানীপর্বের অন্যতম রাষ্ট্রদার্শনিক হলেন জিয়াউদ্দিন বরণী (খ্রীঃ ১২৮৫-১৩৫৯)। আমরা রাষ্ট্র সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরণীর বক্তব্য এখানে আলোচনা করব।

জিয়াউদ্দিন বরণী সুলতানীযুগের অন্যতম রাষ্ট্র দার্শনিক যিনি জীবনের প্রথমদিকে সুলতানী রাজদরবারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন কিন্তু মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে এই প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। রাজদরবার থেকে বিতারিত বরণী রাজনৈতিক দর্শনের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী রচনা করেন। সম্ভবত এই রচনার লক্ষ্য ছিল যাতে সুলতান ফিরোজশা তুঘলকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায়।

বরণী মধ্যযুগের ইউরোপীয় তাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন (খ্রীঃ ৩৫৪-৪৩০) মত দুই রাজ্যের তত্ত্ব হাজির করেন — ঈশ্বরের রাজ্য এবং ইহলোকে সুলতানের রাজ্য। ঈশ্বরের রাজ্য হল প্রকৃত রাজ্য এবং ঈশ্বর হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বর বা আল্লাহ ইহলোকে কাউকে কৃপা করেন আবার কাউকে শাস্তি দেন। আবার অনেক ব্যক্তিকে ইহলোকে কৃপা বা শাস্তি না দিয়ে পরলোকের জন্য কৃপা বা শাস্তি রেখে দেন। তিনিই বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা করেন এবং সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনিই প্রকৃত সম্রাট ও সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ইহজগতের মানুষের সমাজে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন পয়গম্বর, জ্ঞানী এবং সুলতানের মাধ্যমে। তিনি সুলতানের উপর দায়িত্ব দেন মানুষের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য।

আমরা হজরত মুহম্মদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দেখেছি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হজরত মুহম্মদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এই দুই ক্ষমতার কোনও বিভাজন হয়নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই দুই ক্ষমতার বিভাজন ঘটতে থাকে। বরণীর রচনাতেও আমরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভাজন লাভ করি। বরণীর মতে ধর্ম আর রাজনীতি অর্থাৎ ধর্মীয় প্রধান এবং রাজনৈতিক প্রধান দুই যমজ ভাই। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি নিরর্থক ; আবার রাজনীতি ছাড়া ধর্ম অসহায়। শুধুমাত্র সুলতানের পক্ষে ন্যায়সম্মত রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভবপর নয় ; আবার শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রধানের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি বলবৎ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর এ কারণেই ধর্মীয় প্রধান এবং রাষ্ট্র প্রধানকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়ে। এ জগতে ভালো এবং মন্দের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে মন্দকে চিরতরে দূর কার যায় না, শুধুমাত্র সাময়িকভাবে দমন করা যায়। একারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ও প্রয়োজন থেকে যায়।

ভারতে মুসলমানগণ (ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই আগেকার সংস্কার থেকে যেমন মুক্ত হতে

পারেনি অপরদিকে সপ্তম শতকের হজরত মুহম্মদের ভাবধারার প্রকৃত মুসলমান পরিবর্তিত কাঠামোয় মূল নীতি থেকেও সরে আসে) যে ইসলামের মূল ভাবধারা অনুসরণ করে না যে সম্পর্কে বরণী দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত ইসলামের ভাবধারায় মুসলমানদের ফিরিয়ে আমার জন্য সুলতান তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। বরণীর মতে, ইদানীং ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতি দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এখনকার মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে নিছক সংস্কার বশে। হজরতমুহম্মদের আবির্ভাবের আগে ইহজগতের প্রাপ্তি, আশা-আকাঙ্খাই যেমন মানুষের মধ্যে ছিল প্রধান, বর্তমানে মানুষের মধ্যেও সেই প্রবণতাই পুনরায় ফিরে এসেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি সুলতানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। এমনকি, এর জন্য প্রয়োজনে সুলতান সন্ত্রাসসৃষ্টি বা চরম ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন। এভাবে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সুলতান অবিশ্বাসীদের, দুর্বিনীতদের এবং সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসীদের প্রকৃত ইসলামে ফিরিয়ে আনবেন। বরণীর মতে, শাসন, প্রাধান্য বা যুদ্ধজয় দারিদ্রের জীবন নিয়ে সম্ভবপর হয় না। সুলতান যদি ক্ষমতা প্রধান, বিত্তবৈভবসম্পন্ন, আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ না হ'ল তাহলে প্রজারা রাজাকে মানবে না; বিনীতরাও দুবিনীত হয়ে পড়বে এবং কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য উধাও হয়ে যাবে — ঈশ্বর যাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন তাকে অর্থাৎ সুলতানকে মান্য করতে ভুলে যাবে; এর ফলে চরম এক অরাজকতা সৃষ্টি হবে। অবশ্য বরণী সুলতানকে একই সঙ্গে ক্ষমতাশালী ও দয়াপ্রবণ হতে বলেছেন। কারণ প্রজাদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুধরণেরই মানুষ আছে। সুলতান মন্দলোকের কাছে নির্দয় হবেন; ভালোমানুষের কাছে দয়া পরবশ হবেন।

সুলতানকে এভাবে সর্বশক্তিমান, আড়ম্বরপূর্ণ করে গড়ে তোলার পরই বরণীর কাছে প্রশ্ন জেগেছে সুলতানের এই প্রকৃতি প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা ? বরণীর মতে, দারিদ্র, অবনত, অনুগত, অহংমুক্তিই ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ প্রস্তুত করে। অথচ ক্ষমতাসম্পন্ন আড়ম্বরপূর্ণ সুলতানের তত্ত্বগতভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকারই কথা। কারণ এসব প্রকৃত ইসলামের বিরোধী। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে বরণী জনগণকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেও সুলতান এর প্রকৃত ইসলাম থেকে সরে থাকাকেই সমর্থন করেছেন এবং সুলতানকে পারস্যের সম্রাটকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেণ। বরণীর বিচারে পারস্য। সম্রাট ইসলামের প্রাধান্যকে বজায় রেখেছেন এবং একই সঙ্গে সিংহাসন, রাজকীয় মর্যাদা, বিলাসবহুল জীবন যাত্রা, দরবারী ব্যবস্থাপনা, বহুরত্নঘোষিত পোষাক, বিরাট হারেম, ব্যয়বহুল জীবন সবকিছুকেই ব্যবহার করেছেন। এই বিচ্যুতিকে বরণী তুলনা করেছেন মুসলমানের পক্ষে মৃত জন্তুর মাংস খাওয়ার সঙ্গে। মৃত জন্তুর মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু চরম ক্ষুধার্তের কাছে তা গ্রহণযোগ্য। সেরকম পারস্যের সুলতাণী ব্যবস্থা ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও প্রয়োজনের তাগিদে তা গ্রহণীয় হতে পারে। নিঃসন্দেহে সুলতানের পক্ষে এজীবন ইসলাম বিরোধী। এবং এর জন্য সুলতান রাত্রিতে (নিভৃতে) ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন; ভেঙ্গে পড়বেন। এভাবে বরণী পরোক্ষভাবে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

বরণীর কাছে প্রকৃত ইসলামে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত করা, অমুসলমানদের ইসলামে দীক্ষিত করা সুলতানের অন্যতম দায়িত্ব হলেও বরণী একথাও বলেন যে ইসলামে বিশ্বাসী সমস্ত পয়গম্বর ও সুলতানগন সকলে এক হলেও অবিশ্বাসীদের দমন এবং প্রকৃত ইসলামে দীক্ষিত করতে পারবেন না। কারণ জগতের

ধর্মই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যা, একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদ অ-পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকতা, আলো এবং অন্ধকার, দিবা ও রাত্রের সহাবস্থান। মিথ্যা না থাকলে যেমন সত্যের উপলব্ধি করা যায় না, মন্দ না থাকলে ভালোকে বোঝা যায় না, সেরকম বহু ঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতাবাদ না থাকলে ইসলামকেও বোঝা যায় না। উভয়ের সহাবস্থানই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। এভাবে বরণী অমুসলিমদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাজার কাছ থেকে বিতাড়িত বরণী সুলতানকে বিজ্ঞলোকর সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন করে দেন। যে কোনও মহৎ সুলতানেরই উচিত হচ্ছে বিজ্ঞব্যক্তিদের নিয়ে এক মন্ত্রণাসভা গড়ে তোলা। পার্ষদরাও রাজাকে খোলাখুলিভাবে নির্ভিক মনে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। কোন বিষয়ে সকলে যখন একমত হবেন তখনই সুলতান সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরামর্শের অর্থ হচ্ছে মতের ঐক্য। দ্বিতীয়ত, পরামর্শদাতাগণ যথাযথভাবে নিযুক্ত হবেন। তাদের অভিজ্ঞতা, আনুগত্য এবং পদমর্যাদাও প্রায় একইরকম হবে, কারণ পদমর্যাদা বা আনুগত্যে যদি ভিন্নতা দেখা যায় তাহলে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য ঘটবে। তৃতীয়ত, পরামর্শদাতাদের কাছে সুলতান কোনও ব্যাপার গোপন করলেন না। উপমা সহকারে বরণী বলেছেন চিকিৎসকের কাছে রোগী যদি কিছু গোপন করে তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে ঠিকমত চিকিৎসা করা যাবে না। চতুর্থত, পরামর্শদাতাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। সত্যভাষণের জন্য তাঁরা সুলতানের রোষে পড়বেন না। পঞ্চমত, পরামর্শের বিষয় গোপনীয় থাকবে। ষষ্ঠত, সুলতান পরামর্শসভায় প্রথমেই নিজের মতামত প্রকাশ করবেন না। অপরের মতামত শোনার পরই তিনি নিজের মতপ্রকাশ করবেন। কারণ, প্রথমেই যদি সুলতান নিজের মত প্রকাশ করেন তাহলে পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে প্রকৃত মতামত নাও প্রকাশিত হতে পারে। কারণ কেউই সুলতানের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে সাহসী হবেন না। এখানে বরণী বিজেতা এবং রাজার মধ্যে পার্থক্য করেন। বিজেতা নিজের ইচ্ছামত লোকদের বাছাই করে সমর্থকগোষ্ঠী তৈরী করেন। সমর্থকগনও সুলতানের প্রশংসাকারী ও অনুগত চাটুকারে পরিনত হয় এবং বিনিময়ে সুলতানের কাছ থেকে সম্পদ সম্মান ক্ষমতা প্রভৃতি লাভ করে। সুলতানের পাশে জমা হতে থাকে যত দুর্বৃত্তের দল। কিন্তু যে শাসকের দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ সেই শাসকের পক্ষে এদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রকৃত পরামর্শকের পরামর্শই নেওয়া উচিত।

৩৫.৭.৩ মুঘল শাসনপর্বে রাষ্ট্র

১৫২৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়জুড়ে ভারতে মুঘল বংশ শাসন ক্ষমতা ভোগ করে। এসময় ইসলাম জগতে এক চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসী খলিফার পতন, খলিফাতন্ত্রকে ঘিরে ইসলামজগতে এক চরম রাজনৈতিক সংকট, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঘটনাগুলির পাশাপাশি তৈমুর এর উত্থান ইসলাম জগতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক তৃতীয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তৈমুর কর্তৃক পারস্যজয়, বাগদাদ অধিগ্রহণ এবং খলিফাতুল্লা পদবি ব্যবহার ইসলাম দুনিয়ার এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর হলেন এই তৈমুর এরই বংশধর।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি।

প্রথমত, মুঘল শাসন পুরোপুরি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সমবিশ্বাসীদের এক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রকে না দেখে রাষ্ট্রকে এক বংশানুক্রমিক পিতৃতান্ত্রিক সত্ত্ব হিসাবেই দেখা হয়। এমনকি অ-মুসলমান নারীর গর্ভজাত সন্তানও সিংহাসনের অধিকারী। অথচ বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক বিষয়টি ছিল একেবারেই ইসলাম বিরোধী। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক সম্পত্তিতে পরিণত হলেও সিংহাসন নিয়ে পারিবারিক কলহ, অন্তর্ঘাত বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আকবরের বিরুদ্ধে তার ভাই এর বিদ্রোহ, পুত্র সেলিম এর বিদ্রোহ, জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে পুত্র খুসরুর এবং পিতার বিরুদ্ধে শাজাহানের বিদ্রোহ, শাহজাহানের বিরুদ্ধে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ আমরা লক্ষ করি। তৃতীয়ত, মুঘল শাসকগণ খলিফার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়েই চরম রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। বাবুর নিজেকে বাদশাহ বা সার্বভৌম হিসেবেই ঘোষণা করেন, নিজের নামে খুৎবা উচ্চারণ করেন এবং মুদ্রাতেও মাত্র প্রথম চার খলিফার নাম উল্লেখ করেন। হুমায়ুন যদিও নিজেকে খলিফা বলে প্রচার করেননি তথাপি তৈমুর বংশধর হিসেবে নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতেন। সম্রাট আকবর ও এই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেন এবং নিজেকে 'সর্বশক্তিমান', 'মনুষ্য আকারে দেবতা' বলে মনে করতেন। আকবরের মত জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সার্বভৌম ক্ষমতাকে সরাসরি আল্লার দান বলে মনে করতেন। একমাত্র আওরঙ্গদেব ধর্মীয় ব্যাপারে মক্কার প্রাধান্য মেনে ১৬৮৪ খ্রীঃ মক্কায় শরীফের কাছে উপঢৌকন পাঠালেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি স্বাধীন। চতুর্থত, মুঘল শাসকদের কাছে ধর্মের চেয়ে রাজনীতিই প্রধান বিষয় ছিল। রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে তাই বাবুর সুন্নি মতাবলম্বী হয়েও শিয়া মতাবলম্বীদের মত মাথায় টুপি/তাজ ব্যবহার, শিয়াদের মত খুৎবা উচ্চারণ, আলি মুর্তাজার নামে প্রার্থনা করতেন। শিয়া-সাহায্যের প্রয়োজন যখন মিটে যায় তখন বাবুর পুনরায় তার আগের অর্থাৎ সুন্নি মতে ফিরে যান। বাবুরের মত হুমায়নুও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পারস্যের সাহায্যের সময় শিয়া মতের প্রতি আনুগত্য দেখান যদিও তিনি বাবুরের মত ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। পঞ্চমত, মুঘল শাসকগন ধর্মের তুলনায় রাজনীতিকে বেশী গুরুত্ব দিলেও রাজনীতির উৎস হিসেবে আল্লাহতালা তথা ধর্মকে মেনে নেন। পার্থক্য হল, এখানে মুঘল শাসকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের মনে করতেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সম্রাট সরাসরি ভাবে আল্লার কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেন। সুতরাং তিনি একমাত্র আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ; অন্যকোনও ব্যক্তি বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে খলিফার কাছে দায়বদ্ধ নন। শাসক হিসেবে তার ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিতও অবিভাজ্য। ষষ্ঠত, মুঘল শাসকগণ পূর্বনির্ধারিত কোনও তত্ত্ব বা ধারণার চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা জানতেন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র শিয়া সুন্নির মতাবলম্বী মুসলমানের বাসস্থান নয়। ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশই হিন্দুসম্প্রদায়ের যারা আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এছাড়া রয়েছে খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠী। এরকম এক বিচিত্র ও বহুধর্মী জনগোষ্ঠীতে কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনা চালু করলে তা বিদ্রোহের পথকেই প্রশস্ত করবে। মুঘল শাসকগণ এব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্ক ছিলেন। ভারতে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে বাবুর হুমায়ুনকে যে পরামর্শ দেন তার মধ্যে এ ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরও ভারতীয় দর্শন ও আচার ব্যবস্থার সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। আরবী ভাষায় পরিবর্তে পার্শী ভাষার ব্যবহার

খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরিতকরণে অনুমতি প্রদান, জিযয়া এবং অন্যান্য তীর্থকর রদ, সামরিকও প্রশাসনিক বিভাগের নিম্ন থেকে উচ্চপদে অ-মুসলমানদের নিয়োগ, অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতের মুঘল শাসনকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে যা পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান শাসনে বিরল এবং সম্ভবত একারনেই গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় মুঘল শাসনকে অ-ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫.৭.৪ মুঘলশাসিত ভারতে চরম রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার কারণসমূহ

মুঘল শাসিত ভারতে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার পিছনে কয়েকটি কারণ এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে আমরা একই সময়ে ইউরোপে রাজতন্ত্রের ক্ষমতার সঙ্গে এক তুলনামূলক আলোচনায় যাব। প্রথমত, মুঘল শাসকগণ ছিলেন বহিরাগত এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেন। একারণে মুঘল রাজতন্ত্র ছিল সামরিক শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের পরাধীন শাসকগণ বা গোষ্ঠীসমূহ এই শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য বারবার সচেষ্ট হয়েছেন। এর ফলে মুঘল শাসকগনকেও সামরিক শাসননির্ভর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাপ্রবণ হতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় সামন্তপ্রভুদের প্রাধান্যও কর্তৃত্ব। কিন্তু ভারতে অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তে ভারতে জাতভিত্তিক স্তরবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় শাসকের সঙ্গে ধর্মযাজকদের (হিন্দু ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের) এক সমঝোতা দেখা যায়। জমি অনুদান, গ্রামদান, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মাধ্যমে শাসক চেয়েছেন যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রনে রাখতে। রাজা এবং যাজক সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হিসেবে অবস্থান করেছেন এবং অস্ত্রের শাসনও শাস্ত্রের শাসন পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠেনি। মুঘল শাসকগণ এই ব্যবস্থাকেই মুলত অনুসরণ করেছেন। মুখল শাসকদের ক্ষমতার প্রতিযোগী কোন নির্দিষ্ট অভিজাততন্ত্র না থাকায় সম্রাট অপ্রতিহত ভাবেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে গেছেন; রাজ্যের কোনও অংশে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোরভাবে দমনে সক্রিয় হয়েছেন। বিপরীতভাবে, স্বৈরাচারী রাজার হাত থেকে নিজগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপে অভিজাতগোষ্ঠী সব সময়েই সজাগ এবং জনসমর্থন আদায়ের তাগিদে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেও তৎপর। এর ফলে ইউরোপে রাজতন্ত্র কমবেশী নিয়ন্ত্রিত। তৃতীয়ত, ইউরোপে রাজার পক্ষে স্বাধীনভাবে জমি বা অন্যান্য বিষয়ে কর আরোপের ক্ষমতা ছিল সীমিত। যুদ্ধের মত ব্যাপক খরচ মেটানোর জন্য রাজাকে সামন্ত প্রভূদের উপর নির্ভর করতে হত এবং এর বিনিময়ে সামন্ত প্রভুরাও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিত; কিন্তু ভারতে মুঘল শাসকদের কর আদায়ের ক্ষমতা ছিল প্রত্যক্ষ এবং চূড়ান্ত। তাছাড়া লুণ্ঠন, যুদ্ধজয়ে প্রাপ্ত সম্পদ রাজকোষকে সমৃদ্ধ করত। এর ফলে মুঘল শাসকগণকে আর্থিক ব্যাপারে সামন্তপ্রভুর মতো কোন গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হয়নি। চতুর্থত, মুঘল রাষ্ট্রে বেতনভুক সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শাসককে সৈন্যের জন্য রাজ্যের মধ্যে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলেনি। সামরিক বাহিনীর কর্মীগণ বেতনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ পেত। এর ফলে সামরিক বাহিনীর কাছে রাজ্যজয়ের বিষয়টি ছিল লাভজনক ও কাম্য। অপরদিকে ইউরোপের শাসকগনের সামরিক সাহায্যের জন্য সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভর করতে হত। পঞ্চমত, ইউরোপে গোষ্ঠী অধিকার সংরক্ষিত করার ব্যাপারে পরিষদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এই পরিষদই আইনের প্রকৃতি, কর

ধার্য বা বাতিলের সম্মতি জানাত। এই পরিষদের সদস্যগণ পুরোমাত্রায় রাজা কর্তৃক মনোনীত নয়। বরঞ্চ বিভিন্নগোষ্ঠীর স্বার্থবহ। মুঘল শাসিত ভারতে অনুরূপ কোন পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। মুঘল শাসকের দরবারে সদস্যগণ শাসক কর্তৃক মনোনীত এবং সম্রাটও এই সদস্যদের মতামত গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। ষষ্ঠত, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধ ইউরোপের ইতিহাসে যে গতি সঞ্চার করেছিল ভারতে তা ছিল অনুপস্থিত। সুলতানী আমলের শেষ দিক থেকেই মুঘল শাসকগণ ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। সম্রাট ও উলেমা উভয়েই ইসলামের রক্ষা ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে একমত। কিন্তু সম্রাটগণ বহুক্ষেত্রেই উলেমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজ মতকে কার্যকর করেছেন। উলেমাগণ ও আর্থিক ব্যাপারে রাজকোষের উপর ছিলেন একান্তভাবে নির্ভরশীল। সপ্তমত, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান (বড় অংশই ধর্মান্তরিত) উভয় সম্প্রদায়ই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। একারণে আইনের রক্ষাবর্তা ও প্রয়োগ কর্ত্তা হিসেবে রাজতন্ত্রের বিকল্প কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা তত্ত্ব সেসময় ভারতে গড়ে ওঠেনি। সর্বোপরি, মুঘলশাসিত ভারতের আয়তন ছিল বিশাল। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা, সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সংবদ্ধ দৃঢ় কোনও জনমত গড়ে তোলার বা আন্দোলন পরিচালনা করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত কারণে মুঘল ভারতে রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে গড়ে উঠেছে এক চরম কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পন্ন রাজতন্ত্র।

৩৫.৭.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্র দার্শনিকের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ মুঘলপর্ব

এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি কিভাবে আরবকেন্দ্রিক ইসলামীয় রাষ্ট্র বাবস্থা ও রাষ্ট্রদর্শন দামাস্কাস, বাগদাদ, সমরখন্ড এবং ইস্পাহানের ঐতিহ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তিত রাষ্ট্রদর্শন ভারতের মাটিতে এসে নতুনকরে আর এক পরিবর্তনের মুখোমুখী হয়। দামাস্কাস, বাগদাদ ও সমরখন্ডের ঐতিহ্য যেখানে সুন্নিভাবাপন্ন, ইরানের ঐতিহ্য সেখানে শিয়াভাবাপন্ন। এই উভয় ঐতিহ্যই বিদেশের মাটিতে আবার পরিবর্তিত হতে থাকে। ভারতে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মীয় ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী বাস করে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী তুলনায় অনেক কম সেহেতু বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিলে রাষ্ট্রপরিচালনায় যে এক ব্যাপক সংকট দেবে সে সম্পর্কে ভারতের মুঘল শাসকগণ ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক। এবং একারণে তাঁরা এমন অনেক পথই অনুসরণ করেছেন যা ইসলামের উদ্ভবের প্রথমদিকের মুসলমান শাসকদের অনুসৃত নীতির বিরোধী। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রশাসকের কী করা উচিত সে সম্পর্কে এসময়ের মুসলমান রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এসময়ের অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে আমরা আবুল ফজল এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শন নিয়ে আলোচনা করব।

মধ্যযুগে ভারতের অন্যতম তাত্ত্বিক আবুল ফজল (খ্রীঃ ১৫৫১-১৬০২) আকবরের শুধুমাত্র পার্ষদই ছিলেন না, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও ছিলেন। তিনি শাসক আকবরকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে না দেখে সকল মানুষের কাছেই গ্রহণীয় শাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পরামর্শ দেন। আবুল ফজল এর মতে, সম্রাট যদি সব শ্রেণীর মানুষকে ও সব ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সমানভাবে না দেখেন তাহলে তিনি ঐপদের যোগ্যই নন। 'আইন-ই-আকবরী'গ্রন্থে আবুল ফজল-রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর

চিন্তাভাবনায় গ্রিক এবং ভারতীয় দর্শনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আবুল ফজল রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন। রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ অন্বেষণে তিনি মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। এব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেন। তাঁর মতে, জগতের অধিকাংশ মানুষই হ'ল স্বার্থপর হাঙ্কামনের মানুষ এবং একারণে সামান্য কিছু পাবার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এর ফলে সমাজে মানুষের মধ্যে কলহ অবশ্যম্ভাবী। এই কলহে দুনিয়া সবসময়েই অবদমিত ও বঞ্চিত হতে বাধ্য। মানুষের এই চরিত্র বিশ্লেষণে ফজলের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্যের মাৎসন্যায়ের ধারণা এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস হবসএর প্রকৃতিরাজ্যের ধারণা ও ম্যাকিয়াভেলীর মানুষের চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবুল ফজলের মতে মানুষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে একমাত্র মুক্তি ঘটতে পারে যদি সমাজ কোনও সর্বশক্তিমান শাসকের দ্বারা শাসিত হয়। রাষ্ট্র তথা সর্বশক্তিমান শাসকের কাছে আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ তার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরে পাবে। সমাজের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব বজায় থাকবে। ফজলের মতো আল ফারাবিও মনে করেন, অরাজক অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্যই রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের সৃষ্টি। ফারাবি ও টমাস হবস এর মতো এক চুক্তির কথা বলেন যেখানে মানুষ নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করেছে এবং তার হাতে সমাজ তথা নিজেদের শাসনকরার ক্ষমতা অর্পন করেছে।

আবুল ফজল অবশ্য রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে চুক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেন। ফজলের মতে, রাজতন্ত্র হল ঈশ্বর তথা আল্লারই দান এবং তখনই তা সৃষ্টি হয় যখন কয়েক হাজার ভালোগুণ কোন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত হয়। আবুল ফজলের মতে, ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় হ'ল রাজপদ। এব্যাপারে তিনি সুলতান বা রাজার উপাধি পাদশাহ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন। পাদ শব্দটির অর্থ হ'ল স্থায়িত্ব এবং ভোগদখল। রাজার যদি কোনও অস্তিত্ত্ব না থাকত তাহলে সমাজ থেকে বিরোধ স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে কখনই দূর করা যেত না। মানুষ বিশৃঙ্খলা এবং লালসায় ধ্বংশের পথেই এগিয়ে যেত। এই বিশ্ব, বড় বড় বাজার তার সমৃদ্ধি হারিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হত। সম্রাটের ন্যায়ের আলোকে কিছু মানুষ আনন্দের সঙ্গেই আনুগত্যের পথ বেছে নেয়; অন্যেরা শাস্তির ভয়ে হিংসা থেকে বিরত থাকে। শাহ শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় সেই ব্যক্তিকে যে অপরকে অতিক্রম করে গেছে। আবার এই শব্দটি স্বামী বা প্রভু অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। সম্রাট হলেন স্বামী বা বিশ্বপতি যেখানে স্ত্রী এই পৃথিবী যা রাজার কাছে অনুগত থাকবে এবং স্তুতি করবে। এই উপমাটির মধ্যে আবুল ফজলের নারী সম্পর্কে ভাবনাও ধরা পড়েছে। রাজনীতি শুধুমাত্র পুরুষের জন্য; নারী সেখানে আনুগতা মাত্র।

আবুলফজল রাজপদকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুরিত আলো, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বিশ্বকে আলোকিত করে। আবুল ফজল ঈশ্বরের এবং সম্রাটের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতাকারীর (যেমন পয়গম্বর বা খলিফা) উপস্থিতিকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, ঈশ্বরের এই দ্যুতি কোনও মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি ছাড়াই সরাসরি সম্রাটের কাছে পৌঁছায়। এই দ্যুতির মাধ্যমে যে সমস্ত মহৎ গুণগুলি সম্রাটের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তা হ'ল (এক) প্রজাদের প্রতি এক পিতৃসুলভ ভালবাসা। রাজাকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ বিশ্রামের জায়গা খুঁজে পায়; সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিরোধেরও ঝড় তোলে না।

জ্ঞানদিয়ে সম্রাট সে যুগের মূলভাবকে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করেন। (দুই) এক বড় মাপের হৃদয় ঃ সম্রাটের বড় মাপের হৃদয় সম্রাটকে পরমতসহিষ্ণু করে তোলে। ছোট বড় সকলের দাবীই তিনি মেটাতে দেরী করেন না। (তিন) ঈশ্বরের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ফলে যখনই রাজা কোন কাজ করেন ঈশ্বরকেই সেই কাজের প্রকৃত কর্তা হিসেবে মনে করেন। (চার) প্রার্থনা এবং ভক্তি। সাফল্যের সময়েও সম্রাট ঈশ্বরের কথা ভুলে যান না। ইচ্ছার দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি যুক্তির দ্বারাই চালিত হন এবং যা গৌণ তার পিছনে সময় নষ্টও করেন না। অন্ধ ক্রোধ যাতে পেয়ে না বসতে পারে তার জন্য সম্রাট ন্যায়ের প্রতি অনুগত থাকেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং অবিচল ভক্তিই রাজাকে ন্যায়ের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে।

ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে এক সাম্যের কথা বললে ও আবুল ফজলের রচনায় আমরা এক শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের চেহারা দেখি এবং এ ব্যাপারে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার প্রভাব থাকতে পারে। আবুল ফজলের রচনাতে সমাজে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। এই চারটি শ্রেণীকে আবুল ফজল আগুন, বাতাস, জল ও মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রথম শ্রেণীটি হল যোদ্ধা, যারা রাজনৈতিক কাঠামোয় আগুনের ধর্মবিশিষ্ট। এদের শিখা বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে বিরোধ ও বিদ্রোহকে দগ্ধ / ধ্বংস করে কিন্তু প্রদীপ হয়ে এই বিক্ষুব্দ পৃথিবীকে আলো দেখায়। দ্বিতীয় শ্রেণী হল বণিক ও কারীগর শ্রেণী যাকে বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাতাস যেমন সর্বত্রগামী এরাও সেরকম সর্বত্রগামী। এদের শ্রম এবং বিচরণে ঈশ্বরের দান (দ্রব্য সামগ্রী) সার্বজনীন হয়ে ওঠে অর্থাৎ সবার হাতে পৌছায় এবং পরিতৃপ্তির বাতাস জীবনের গোলাপকুঞ্জকে স্নিগ্ধ করে। তৃতীয় শ্রেণী হল জ্ঞানী যেমন দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যামিতি বিশারদ এবং জ্যোর্তিবিদ যাঁদেরকে জলের তুলনা করা যায়। এদের কলম এবং বিজ্ঞতা থেকে তৃষিত পৃথিবীতে ঝর্ণা নামে এবং সৃষ্টির উদ্যান জলসিঞ্চনে সতেজ হয়ে ওঠে। চতুর্থ শ্রেণী হ'ল কৃষক এবং শ্রমিক যাঁদেরকে মাটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এদের প্রচেষ্টায় জীবন শষ্য-পূর্ণতা পায় এবং এদের শ্রম থেকে শক্তি ও শান্তি প্রবাহিত হয়। সম্রাটের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হল প্রত্যেকে তার নিজের কাজটুকু করেছে কিনা দেখা। এভাবে সকলে যদি ব্যক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা মিশিয়ে কাজ করে তাহলে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আবুল ফজলের এই ব্যক্তব্যে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার প্রতিফলনই লক্ষ করা যায়। যদিও এই শ্রেণীগুলিতে অংশগ্রহণ জাত ব্যবস্থার মতো বংশানুক্রমিক কিনা সম্পর্কে আবুল ফজল কোন বক্তব্য রাখেননি। হয়ত এখানে আবুল ফজলের উপর গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর প্রভাবই প্রধান।

৩৫.৮ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসকের কার্যাবলী

আমরা রাষ্ট্রসম্পর্কে ইসলামীয় তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি হজরত মুহম্মদ একদিকে ছিলেন নতুন গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক, সেনাবাহিণীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান আইনপ্রনয়নকারী, ন্যায় বিচারের উৎস, প্রধান বিচারপতি ও যাবতীয় ক্ষমতার ও প্রভুত্বের অধিকারী। পরবর্ত্তীকালে ইসলামের সম্প্রসারণের যুগে রাষ্ট্রের তথা শাসকের কোন কোন কাজগুলি করা উচিত সে সম্পর্কে মুসলমান তাত্ত্বিকগণ মতামত প্রকাশ করেন। একাদশ শতকের বাগদাদের অন্যতম তাত্ত্বিক অল-মওয়ার্দী (খ্রীঃ ৯৭৪-

১০৫৮) সম্রাটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলির উল্লেখ করেন। মওয়ার্দীর মতে, রাষ্ট্রশাসকের অন্যতম কাজ হল ঃ

১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ধর্মের রক্ষা,

২) আইনগত বিরোধের নিষ্পত্তিকরা,

৩) ইসলাম ভূখন্ডকে রক্ষা করা,

৪) দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়া,

৫) সীমান্তরক্ষায় সৈন্য মোতায়েন করা,

৬) ইসলাম গ্রহণে বা ইসলামের প্রতি বশ্যতাস্বীকারে অন্যর প্রতি যুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা করা,

৭) কর সংগ্রহ ও কর ব্যবস্থা পরিচালনা করা,

৮) কর্মচারীদের বেতনব্যবস্থা ও রাজকোষ পরিচালন,

৯) সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ,

১০) সরকারী কাজগুলির তদারকী করা।

ভারতে মুঘল শাসকগণ ছিলেন অবিভাজ্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। আবুল ফজল বা বদাউনীর রচনায় মুঘল শাসকদের কাজগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাজগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ধর্মসংক্রান্ত এবং (২) রাজনৈতিক ।

ধর্মের অন্যতমরক্ষক হিসেবে সম্রাটের কাজ হল-

১) শরিয়ত তথা ধর্মীয় আইনকে রক্ষা করা,

২) ধর্মের অভিভাবক হিসেবে কাজ করা,

৩) ইসলামের মতাদর্শ প্রচার করা,

৪) মসজিদ প্রতিষ্ঠাও রক্ষণাবেক্ষণ করা, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করাও উলেমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা

৫) মন্দির, মসজিদ, মহাপুরষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। মুঘল শাসকগণ ও হিন্দুদের মন্দির নির্মানে বা পরিচালনায় আর্থিক অনুদান বা জমি বন্দোবস্ত করতেন এমন নজীর ও পাওয়া যায়।

৬) ভিখারীদের সাহায্যদান। আবুল ফজলের রচনা থেকে জানা যায় বাদশাহের নজরে পড়া প্রত্যেক ভিখারী সাহায্য পেতেন। বদাউণী উল্লেখ করেন যে এই সাহায্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পেতেন। খয়রাতপুর নামে বিভিন্ন সাহায্যস্থান ও গড়ে তোলা হয়।

সম্রাটের রাজনৈতিক কাজগুলি হল ঃ—

১) ইসলাম ভূখন্ডের সম্প্রসারণ,

২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা,

৩) সুশাসন প্রতিষ্ঠা,

৪) আশ্রিতদের এমনকি অন্যধর্মের হলেও, নিরাপত্তার বিধান করা,

৫) জিযয়া কর সংগ্রহ,

উপরের কাজগুলি ছাড়াও মুঘল সম্রাটগণ কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন এবং সে ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। যেমন (এক) মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থা একান্তভাবে রাজতান্ত্রিক হওয়ায় সম্রাট মাঝে মাঝে জনসমাজে দর্শন দিতেন যা ঝড়োকা-ই-দর্শন নামে পরিচিত। এই প্রথাটি আকবর চালু করেন। পরবর্ত্তীকালে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব এই প্রথাটিকে প্রশাসনিক ও বিচার বিষয়ক কাজেও ব্যবহার করেন। আবুল ফজলের বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের পর সম্রাট ঝাড়োকায় উপস্থিত হলে সৈনিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, মজদুর, দীন দুঃখী জনসাধারণ সম্রাটের দর্শন লাভের জন্য তাড়াহুড়ো ও দৌড়ঝাঁপ শুরু করত। আবুল হামিদখান লাহোরীর মতে, শাহজাহান ঝাড়োকা দর্শনের পর জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শুনতেন,ঝাড়োকা-ই-দিওয়ানে প্রবেশ করে সরকারীকাজের তদারকি করতেন। বদাউণীর মতে, আকবর প্রবর্তিত এই ঝাড়োকাদর্শনে হিন্দু প্রভাব রয়েছে। যদুনাথ সরকারের মতে, ঝাড়োকাদর্শন হিন্দু প্রথা বলে আওরঙ্গজেব এই প্রথা পরবর্ত্তীকালে বাতিল করেন।

দ্বিতীয়ত, সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ কুর্নিশ ও তশলীম ব্যবস্থা চালু করা হয়। সম্রাটের সামনে প্রজাদের নতজানু হয়ে আনুগত্য দেখাতে হ'ত। তৃতীয়ত, একমাত্র নবাবই উপাধি বিতরণের অধিকারী ছিলেন। চতুর্থত, মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন পরিচালন ও নতুন মুদ্রার চালু করার ক্ষেত্রে সম্রাটের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। আবুল ফজলের রচনার ২৬ রকমের সোনার মুদ্রা, ৯ রকমের রূপার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তামার মুদ্রাও চালু ছিল। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ। পঞ্চমত, রাষ্ট্রে কোনও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্রাট শীলমোহর ব্যবহার করতেন। সম্রাটের শীলমোহর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হ'ত। ষষ্ঠত, মৃত্যুদন্ড বা অনুরূপ কঠোর শাস্তিদান একমাত্র সম্রাট দিতে পারতেন। আবার কোনও বন্দীর প্রতি ক্ষমা বা মুক্তিদান সম্রাটের বিশেষাধিরার বলে গণ্য হত। ব্যক্তিগতভাবেও সম্রাটগণ বিচার করতে পারতেন এবং এব্যাপারে সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত ছিল। যেমন আকবর বৃহস্পতিবারে, জাহাঙ্গীর মঙ্গলবারে এবং শাহজাহান বুধবারে ব্যক্তিগতভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সপ্তমত, সম্রাটের প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেখা যায়। যেমন এতে সম্রাটও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটে। সম্রাটের পক্ষে ও গোটা দেশের অবস্থা জানার যেমন সুযোগ ঘটে অপরদিকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রভাব ও এতে কমে। অষ্টমত, এ. কে. এম. আবদুল আলীম এর মতে খুৎবা, তিরাজ ও সিক্কাহ এই তিনটি ছিল রাজকীয় বিশিষ্ঠ সম্মান চিহ্ন। মুঘল শাসকগণ এই তিনটিকেই স্বাধীনভাবে ব্যবহার

করতেন। সিক্কাহ্ বা মুদ্রা সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। খুৎবা হ'ল সমবেত উপাসনায় ধর্মোপদেশ। দিল্লীর সুলতানগণ আব্বাসী খলিফাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি নেওয়ায় খুৎবার প্রথমে খলিফার নাম উচ্চারণ করে পরে নিজেদের নাম উল্লেখ করতেন। কিন্তু মুঘল শাসকগণ খুৎবাতে খলিফাদের নাম উল্লেখ না করে নিজেদের নামই উচ্চারণ করতেন। তিরাজ এর অর্থ হল সুন্দর সূচের কাজ। সম্রাট সোনা রূপার কারুকার্যে সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত থাকতেন। নবমত, ইসলাম সমভ্রাতৃত্বের সাম্যতে বিশ্বাসী হলেও ধর্মীয় উপাসনাগৃহে যাওয়ার সময় একমাত্র সম্রাটই পাল্কী ব্যবহার করতে পারতেন।

৩৫.৯ সারাংশ

এই এককটিতে প্রাক্-ইসলামীয় পর্বে আরবদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃতি, হজরত মুহম্মদ ও মুহম্মদ পরবর্ত্তী সময়ে ইসলামীয় চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ, ভারতে ইসলামের আগমন, সুলতানী ও মুঘল পর্বে ভারতে ইসলামীয় চিন্তার গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মুসলমান আমলে ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থা, আদর্শ, রাষ্ট্রশাসকের ভূমিকা, ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি।

৩৫.১০ অনুশীলনী

(১) রাষ্ট্র সম্পর্কে আবুল ফজল এর মতামত ব্যক্ত করুন।

(২) খলিফাতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামীয় রাষ্ট্রদার্শনিকদের বক্তব্যগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) রাষ্ট্রও রাজনীতি সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরণীর মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) খলিফাতন্ত্র কাকে বলে ?

(২) কুর-আন কোন সময় গ্রথিত হয় ?

(৩) ইসলামীয় দর্শন অনুযায়ী সুলতানকে মান্য করার কারণ কী ?

(৪) ইসলামীয় দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী ?

৩৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

এ. কে. এম. আবুল আলীম (১৯৭৬/১৯৯২) - ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান (১৯৭৭/১৯৮৪)- ইসলামঃ রাষ্ট্রও সমাজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

Ainslie T. Embree (ed) (1958/1992) - Sources of Indian Tradition. Vol. I. New Delhi, Penguin Books.

M. L. Roychowdhury (1951) - The State and Religion in Mughal India, Calcutta Indian Publicity Society.

R.P. Tripathi - (1936/1992) - Some Aspects of Muslim Administration, Allahabad Central Book Deport.

একক ৩৬ □ সুফিবাদ ও ভক্তিআন্দোলন

গঠন

৩৬.০ উদ্দেশ্য

৩৬.১ প্রস্তাবনা

৩৬.২ সুফিবাদ

- ৩৬.২.১ সুফিশব্দটির অর্থ
- ৩৬.২.২ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য
- ৩৬.২.৩ সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ
- ৩৬.২.৪ ভারতবর্ষে সুফিবাদ
- ৩৬.২.৫ সুফিসাধকদের অবদান
- ৩৬.২.৬ জনকল্যানকর কার্যসম্পাদন
- ৩৬.২.৭ সাংস্কৃতিক সমন্বয়
- ৩৬.২.৮ ইসলামের প্রসার
- ৩৬.২.৯ রাজনীতি ও সুফি সাধক

৩৬.৩ মধ্যযুগে ভক্তিআন্দোলন

- ৩৬.৩.১ ভক্তি সাধনা কাকে বলে
- ৩৬.৩.২ ভক্তি সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ৩৬.৩.৩ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ
- ৩৬.৩.৪ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ইসলামের প্রভাব
- ৩৬.৩.৫ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি
- ৩৬.৩.৬ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঃ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

৩৬.৪ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন

- ৩৬.৪.১ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন ঃ প্রথম পর্ব
- ৩৬.৪.২ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দেলন ঃ দ্বিতীয় পর্ব

৩৬.৫ ভক্তি আন্দোলন ঃ মহারাষ্ট্র

৩৬.৬ ভক্তি আন্দোলন ঃ উত্তর ভারত

৩৬.৭ ভক্তি আন্দোলন ঃ পূর্ব ভারত

৩৬.৮ ভক্তি আন্দোলন ও নারী

৩৬.৮.১ ভক্তি সাধকগণের দৃষ্টিতে নারী

৩৬.৮.২ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা অনুসারী ভক্তি সাধিকা

৩৬.৮.৩ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনে বিরোধী ভক্তি সাধিকা

৩৬.৯ ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

৩৬.১০ সারাংশ

৩৬.১১ অনুশীলনী

৩৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব তা হল—

(১) সুফিবাদ বলতে কী বোঝায় ও সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী;

(২) ভারতে সুফিবাদের প্রসার ও ভারতীয় সমাজে সুফিদরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান;

(৩) সুফিবাদের সঙ্গে ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক ; ভারতে ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবে সুফিবাদের কোনও ভূমিকা আছে কিনা;

(৪) ভারতে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ;

(৫) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন দক্ষিণভারতে, মহারাষ্ট্রে, উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি;

(৬) ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ;

(৭) ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল;

(৮) ভক্তি আন্দোলন যেহেতু কোন দেশ, কাল বা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয় সেহেতু আমাদের যুগেও এই ভক্তি ভজনার কোন ধারা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারব। ভক্তি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি, যেমন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন, জাতভেদের অবসান, সামাজিক সমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে শিক্ষা নিতে পারব।

৩৬.১ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগে ভারতে একদিকে সুফিবাদ বা ইসলামীয় মরমিয়া সাধনা, অপরদিকে ভক্তি সাধনা বা হিন্দু মরমিয়া সাধনার বিকাশ দেখা যায়। কমবেশী প্রায় একই সময়ে এই দুই মরমিয়া সাধনার বিকাশ ঘটায়

পন্ডিতগণ এই দুই ঘটনার, অর্থাৎ, সুফিবাদ ও ভক্তিআন্দোলনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। একদল পন্ডিত একটি ঘটনার কারণ হিসেবে অন্য ঘটনাটির উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সুফিবাদে প্রেমের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির তথা ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপন, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের করুণা বা প্রসাদ ভিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি হিন্দুদর্শনের বিশেষভাবে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব। ঠিক এর বিপরীত কথাটি শোনা যায় অপর একদল তাত্ত্বিকের থেকে যাঁরা মনে করেন, হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ইসলামের একত্ববাদ, সামাজিক সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলি থেকে।

আবার বেশকিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনকে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক বিরোধীতা থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। সুফিবাদের প্রসার ঘটেছে অস্ত্রের পরিবর্তে প্রেম ভালবাসা দিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণের জন্য। অপরদিকে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে ইসলামের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে বিশেষ করে ধর্মান্তরিতকরণকে বন্ধ করার জন্য।

তৃতীয় দলভুক্ত তাত্ত্বিকগণ মনে করেন মুসলমান এবং হিন্দু মরমীয়া সাধকগণ উভয় ধর্মেরই আনুষ্ঠানিকতা, গোঁড়ামি ও পরস্পর বিরোধীতাকে বর্জন করে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা ও মিলনের চেষ্টা করেছেন যদিও এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর রক্ষণশীল অংশের বিরোধীতায়।

আমরা এই এককে সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে সুফিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সুফিবাদ কাকে বলে, সুফি শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ ও বিকাশ—প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনায় থাকবে। ভক্তিসাধনা কাকে বলে, হিন্দু ভক্তি সাধনার উদ্ভবের কারণ, ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে পরবর্ত্তী পর্যায়ে । ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল এর বিষয়টিও আমরা আলোচনা করব পরিশেষে।

৩৬.২ সুফিবাদ

সুফি শব্দটি সাধারণত ইসলামে মরমিয়া সাধনা ও সাধুসন্তদের নামের সঙ্গে জড়িত। এই সাধুসন্তদের প্রচলিত মতকেই সুফিবাদ বলা হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ এই শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক ভাবে শুরু হতে থাকে; যদিও কারো মতে এই শব্দটি প্রাক্-ইসলামীয় যুগেতে আরবে প্রচলিত ছিল। ভারতে ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সুফিবাদের ও বিকাশ লক্ষ করা যায়। আমরা এই অংশে সুফিবাদ নিয়ে আলোচনা করব। সুফি শব্দটির অর্থ, সুফিবাদ বলতে কী বোঝায়, সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ, ভারতে সুফিবাদের প্রসার , ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সুফিবাদের অবদান প্রভৃতি বিষয়গুলি আমরা এখন আলোচনা করব।

৩৬.২.১ সুফি শব্দটির অর্থ

সাধাবণ মত হ'ল সুফি শব্দটি এসেছে সুফ বা রুক্ষ পশম থেকে। মরমিয়া সাধকগণ রুক্ষ পশমের জোব্বা পরতেন বলে এই সাধুসন্তদের সুফি নামে অভিহিত করা হয়। গিব ইবনে সিরিন (মৃত্যু খ্রিঃ ৭২৯) এর মতে খ্রীষ্টান কৃচ্ছ সাধকগণ প্রথমে এই ধরনের পোষাক পরতেন। যিশু ভক্তদের অনুসরণ করে

মুসলমান সম্প্রদায়ের কঠোর সংযমীগণ ও এই ধরনের পোষাক ব্যবহার শুরু করেন। দ্বিতীয় মতে, সুফ শব্দটি উদ্ভব আরবি শব্দ সাফা অর্থাৎ পবিত্রতা থেকে। চারিত্রিক পবিত্রতা বা বিশুদ্ধি যেহেতু সুফি জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেহেতু এই ধরনের সাধকগন সুফিনামে পরিচিত হ'ন। তৃতীয় মত অনুসারে, সুফ শব্দটি শ্রেণী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সুফি হ'ল আল্লাহর নিকটবর্তী শ্রেণী। চতুর্থ মতে, সুফি শব্দটি এসেছে সুফফা (সমতল ছাদ) থেকে। হজরত মুহম্মদের বেশ কিছু সঙ্গী সংযমী জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এঁদের কোন পরিবার বা গৃহ ছিল না। তাঁরা রসুলের নির্মিত মসজিদে বাস করতেন এবং সুফফা বা সমতল ছাদের উপর শয়ন করতেন। পঞ্চম মতটি অনুযায়ী, সুফি কথাটি এসেছে সাফাহ অর্থাৎ ছোট ঢিপি বা টিলা থেকে। এই ধরনের টিলায় একদল মুসলমান গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় সমবেত হতেন বলে এই ধরনের গোষ্ঠীকে সুফি বলা হত।

৩৬.২.২ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

সুফি সাধকগণ প্রেম ও ভক্তির উপর তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খায় প্রাতিষ্ঠানিকতা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিবর্তে প্রেমের পথকেই বেশী পছন্দ করতেন। একদিকে স্রষ্টা বা আল্লাহর মধ্যে তীব্র ভালবাসা অপরদিকে এই ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নতি - এই দু'ই ই সুফি সাধকদের লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'যাত্রা' আর ঈশ্বরের অন্বেষণকারী হলেন যাত্রী/সালিক/ ভ্রমণকারী। এভাবেই যাত্রী/সালিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্তর ভেদ করে স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে চালিত হ'ন। এবং অবশেষে পরমসত্তার সঙ্গে মিলনে স্বকীয়সত্তার বিনাশ ঘটান যাকে বলা হয় ফানা-ফিল-হকিকত। এই শেষস্তরে সুফি সাধক যখন আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পৌছে সবসময় স্রষ্টার বা আল্লার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় থাকেন তখন তিনি 'বাকিবিল্লাহ' লাভ করেন। আল্লার মধ্যে সুস্থিতিই সুফির চরম লক্ষ্য।

সুফিবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সুফিগণ কয়েকটি প্রশিক্ষণ স্তরের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা বা আল্লার সঙ্গে মিলিত হতে চান। এর জন্য প্রয়োজন মিলনের চরম আকাঙ্খা বা আকুতি এবং শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণ। একারণে সুফিগণ সাধারণত রাজনীতি বা ঐশ্বর্যের থেকে দূরে থাকতে চান। দ্বিতীয়ত, সাধনার পথে চলতে গিয়ে দরকার এক পথ প্রদর্শকের। এই পথ প্রদর্শকই হলেন সেখ বা পীর যিনি সাধকের ব্যক্তিসত্তাকে চরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার পথ বদলান। তৃতীয়ত, মালিক বা সাধক সাধনার জন্য পীরের/গুরুর আস্তানায় বাস করে পীরের সেবা ও আধ্যত্মিক কাজকর্মে পীর বা গুরুকে অনুসবণ করেন। চতুর্থত, পীর বা গুরু তাঁর মৃত্যুর আগে শিষ্যদের মধ্যে একজনকে প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যান। পরবর্ত্তীকালে এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হতে থাকে। পঞ্চমত, সুফিগন আত্মোন্নতি বা আত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়াও ইসলামের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন। সুফি জালাল উদ্দিন রুমীর বক্তব্য এক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে। রুমীর মতে, মানুষের হৃদয় জয়করাই সবচেয়ে বড় তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় হাজার কাবার চেয়েও শ্রেয়। কারণ কা'বা তো কেবল ইব্রাহিমের গৃহ কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লাহ্‌ একমাত্র আবাস (ডঃ এম. এ. রহিম - ১৯৮২)। ষষ্ঠত, সুফিগন জীবের বিকাশকে এক চক্রের সঙ্গে তুলনা করেন। রুমীর মতে, জীবন মানেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার পথ

পরিক্রমা। জীবন প্রক্রিয়া ক্রমানুসারে এগিয়ে যায়, যেমন খনিজপদার্থ উদ্ভিদে, উদ্ভিদ প্রাণীজীবনে, প্রাণী মানবজীবনে, এবং মানুষ অতিমানুষের পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরিনামে তার আদি উৎপত্তিস্থলে প্রত্যাবর্তন ঘটে। আর এক সুফি রাবেয়া (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) প্রেমের মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকেই প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেন। রাবেয়া বলতেন, আল্লাহর প্রেম আমাকে এত বেশী নিমগ্ন করেছে যে আর কারো প্রেম বা ঘৃণাই আমার অন্তরে নেই।

৩৬.২.৩ সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ

সুফি শব্দটির অর্থ নিয়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কেও সেইরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। জোনস বা ক্রেমার বা হটেনের মত একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা সুফিবাদের উদ্ভবের পিছনে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনকে দায়ী করেন। হিন্দু বেদান্তদর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন বিশেষ করে মহাযানদর্শন সুফিবাদের উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে এ ধরনের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। দ্বিতীয় দলে রয়েছেন সেই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ যাঁরা সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ হিসেবে খ্রীষ্ট মরমীয়া সাধকদের অবদানকে উল্লেখ করেন। এই মত অনুসারে নবম শতকেই অর্থাৎ ইসলামের উদ্ভবের কিছু পরেই গ্রিক দর্শন বিশেষ করে প্লেটোর দর্শন এবং খ্রীষ্টীয় দর্শনের সঙ্গে আরবজগতের পরিচয় ঘটে। খ্রীষ্টধর্মের কৃচ্ছসাধকগণের সাধনা ও জীবনচর্চা সুফিবাদের জন্ম দেয়। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যেমন অধ্যাপক ম্যাসিগনো যাঁরা মনে করেন, সুফিগণ প্রেরণা লাভ করেছেন হজরত মুহম্মদের জীবন ও কুর-আন থেকেই। দারিদ্র (ফকর), ধ্যান (জিকর), ধৈর্য (সবর) ও ত্যাগ (জেহাদ) প্রভৃতি সুফিবাদের অনুসৃত যাবতীয় অনুশীলন কুর আনের এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

আজিজ আহমেদও মনে করেন সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছে ইসলামের মধ্য থেকেই এবং এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় হজরত মুহম্মদের সহকর্মীদের মধ্যে। সে সময় কুফা, বসরা ও মদীনার ধর্মীয় জীবনে ভক্তিবাদই ছিল প্রধান। ইসলামের উদ্ভবের প্রথম দুই শতকের মধ্যে যখন এই সুফি ভাবধারার বিকাশ ঘটে তখন ইসলাম ছিল বাইরের প্রভাব মুক্ত। পরবর্ত্তীকালে ইসলামের সঙ্গে গ্রিক সভ্যতা, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ ঘটে এবং ইসলামের ম রমীয় ধারার তথা সুফিবাদের ধারা স্ফীত হয়। কিন্তু এই ধারার উৎস ছিল ইসলামের মধ্যেই নিহিত।

চতুর্থ আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যারা মনে করেন, হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফাতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাদের জাগতিক ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি যে নির্লজ্জ প্রকাশ ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে তারই প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রাতিষ্ঠানিকতার পরিবর্তে প্রেম, ভালবাসা, ও ভক্তির মাধ্যমে আল্লার সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য, প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের পৃষ্ঠপোষক মুসলমান উলেমাগণ সুফিদের বিরোধী ছিলেন। উলেমাগণ ছিলেন কুর'আন ও শরিয়ত এর আক্ষরিক প্রয়োগের পক্ষপাতী। শরিয়তের ব্যাখ্যার জন্য মুফতি বা কাজী হিসেবে রাজদরবারে নিযুক্তি ও জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থসাহায্যও ঘটতে থাকে। জাগতিক বিষয়গুলির উপর এবং প্রত্যেকে শরিয়তি নিয়ম ঠিক মত মেনে চলছে কিনা সম্পর্কে উলেমাগণ ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু সুফিগণ বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, অনুশাসন ইত্যাদির

পরিবর্তে অন্তরের প্রেম ভালবাসা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বর তথা আল্লাহতালাকে পেতে চান কামালউদ্দিন হোসেন ইসলামধর্মে শরিয়তবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেন 'রবীন্দ্রনাথ ও মুঘল সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৯৯৮) — ''তত্ত্বের দিক থেকে শরিয়তবাদ দ্বৈতবাদী। সুফিবাদীরা মোটের উপর অদ্বৈতবাদী। সাধনার দিক থেকে শরিয়তবাদ নামাজ রোজা পালনে পাবন্দ। সুফীবাদীরা জিকর-আযকর বা ধ্যান আরাধণায় বেশী জোর দেন'' (পৃ ঃ-২৫৮)। বলাবাহুল্য, রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই মরমীয়া সাধকদের আদৌ পছন্দ করতেন না। দশম শতকে সুফি হল্লাজ যখন দাবী করলেন, 'আমিই সত্য' তখন রক্ষণশীলগণ হল্লাজকে শুধু ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যাই করেনি, হত্যার আগে বেত্রাঘাত করা হয় এবং একে একে হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং তারপর ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় সে সময় রক্ষণশীল মুসলমানগণ এই সুফি দরবেশদের সম্পর্কে কতটা বিরূপ ছিল।

৩৬.২.৪ ভারতবর্ষে সুফিবাদ

হজরত মুহম্মদের মত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই আরবে ইসলামীয় মরমীয়া সাধনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে সুফি সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাসান-আল বসরী (খ্রীঃ ৬৪২-৭২৮)। ইনি তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সমসমায়িক ছিলেন। অষ্টমশতকের মহিলা সুফি রাবেয়া (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) স্রষ্টা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার ব্যকুলতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ঐশী প্রেমের বিষয়টি তুলে ধরেন। রাবেয়ার সময়ে আর একজন সুফি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ইনি হলেন ইব্রাহিম বিন-আদম এভাবে সুফি সাধনা ক্রমশ বসরা থেকে বাগদাদে প্রসারিত হতে থাকে এবং আল মুসাবিবি (খ্রীঃ ৮৪৭) আনজুনায়েদ (খ্রীঃ ৯১০) জুন্নুন-আল মিস্ত্রি (খ্রীঃ ৮৫৬) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এভাবে সুফি ভাবধারা একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হতে থাকে অপরদিকে মত ও পথকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সৃষ্টি হয়। ড: এস.এ.রহিম (১৯৬৩) এর মতে সুফি সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা প্রায় ১৭৫।

খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকেই বিভিন্ন সুফি সাধক ভারতে আসতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (খ্রীঃ ১১৪২ - ১২৩৬) যিনি ১১৯২ খ্রীঃ ভারতে আসেন এবং কিছুদিন লাহোরে ও দিল্লিতে কাটিয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন আজমীরে। ইনি হলেন ভারতে চিশতিয়া তরীকা'র (পথ/সম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠাতা। চিশতি সিলসিলায় (আশ্রমে/আখড়ায়) হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল খুব প্রিয়। এই সম্প্রদায়ের সুফিগণ সম্পদ ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায়ের অনেক সুফি রাজনীতির কাছাকাছি আসেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখ হাসিউদ্দিন নাগোরী রাজপুতানায়, বাবা মরিদ পাঞ্জাবে, খাজা কুতুবউদ্দিন বখতীয়ার কাকী দিল্লিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

খাজামইমুদ্দিন চিশতির পরেই ভারতে যে সুফি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি হলেন সোহরাবর্দী (খ্রীঃ ১১৪৪-১২৩৪)। ইনি মুসলমান জগতের এক সংকটময় মুহূর্তের (১২১৪ খ্রীঃ যখন চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে শুরু হয় মঙ্গোলীয়দের আক্রমন। এবং একারণেই সম্ভবত সোহারাবর্দীর দর্শনে ফুটে উঠেছে এক নৈরাজ্যবাদী মরমী সুর। বাহাউদ্দিন জাকরিয়া বাগদাদে গিয়ে সোহরাবর্দীর কাছে দীক্ষা নিয়ে